সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বসুধা আর তাঁর মেয়ে

BanglaBook.org

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এক ভোরবেলায় জুলি দেখে ফেলেছিল রহস্যময় দৃশ্য। মা বসুধা অচেনা পুরুষের সঙ্গে চুম্বনরত। দৃশ্যটা জুলির গভীরে প্রোথিত হয়ে যায়। জীবনের এক পর্যায়ে মুখোমুখি হয় মা ও মেয়ে, দুই নারী। উঠে আসে কি কোনও গোপন সত্য? যা প্রকৃতপক্ষে এক বিপন্ন ভালবাসা ?

জন্ম : ২১ ভাদ্র। ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত।
শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ংকর সুন্দর'। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে।
১৯৮৩ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে।
গ্রন্থ-সংখ্যা : দ্বিশতাধিক।
একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ □ বিমল দাস

বসুধা আর তাঁর মেয়ে

আনন্দ নভেলা

বসুধা আর তাঁর মেয়ে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ সমীর সরকার
© সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
ISBN 978-81-7756-987-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
এস ডি প্রিন্টার্স ৩২/এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

BASUDHA AR TANR MEYE
[Novel]
by
Sunil Gangopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

১০৫.০০
The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রাখী ও নবকুমার বসু-কে

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

জুলির কথা

এক ডিসেম্বর মাসের ভোরবেলা আমি একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। না, না, স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়, একটা দৃশ্য যা আমার মনে সারা জীবনের মতন ছাপ ফেলে দেয়। এই দৃশ্যের কথা কারুক্কে বলতে নেই, আমি বলিনিও কখনও। কিন্তু সেই একটি মাত্র দৃশ্যের তাৎপর্য সারা জীবনে কতবার যে বদলে যায়, আমার জীবনেও যে তার কত প্রভাব পড়েছে, তা না বললে বোঝানো যাবে না।

আমার বয়স তখন ন'বছর সাত মাস। সে-বছর খুব শীত পড়েছিল, নাকি ছোটবেলায় শীত বেশি মনে হত? অত ভোরে আমার জেগে ওঠার কথা নয়। হঠাৎ আমার শরীরের এক জায়গায় একটা তীব্র ব্যথা শুরু হল। যেন একটা গরম, মোটা সুচ ঢুকিয়ে দেওয়ার মতন। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে, গা থেকে লেপ সরিয়ে উঠে বসতেই ব্যথাটা একটু কমল। কিন্তু এক্ষুনি আবার হতে পারে, এই ভয়ে কাঁপতে লাগল শরীর। ওরকম ব্যথার কোনও অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না।

এরকম অচিন্তনীয় কিছু ঘটলে ওই বয়সের মেয়েরা তো মায়ের কাছেই ছুটে যায়। আমার শুধু হলুদ ফ্রক ও প্যান্টি পরা, গরম জামা খোঁজার সময় নেই, ওই ঠান্ডার মধ্যেই আমি ছুটে গেলাম বাইরে।

মুর্শিদাবাদে কবুতরহাটি গ্রামে আমাদের বাড়িটি বেশ বড়।

BanglaBook.org

সেকেলে। আমার দুই ঠাকুরদা জমিদার ছিলেন। জমিদার মানে, জমিদারের বংশ আর কী, বাবাদের আমলে ওই বাড়িখানা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। মোটা মোটা দেওয়াল, বড় বড় থাম, তলার ঘরগুলো স্যাঁতসেঁতে। সে বাড়ি কবেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু স্মৃতিতে সেটা এখনও জ্বলজ্বল করে। আমার মনে আছে অনেক ছোট-বড় ছাদ ছিল। তা ছাড়া কী সব শরিকি ভাগ-টাগ ছিল জানি না, তবে সেই সময় আমাদের বাড়িতে প্রচুর লোক।

আমি আর দাদা এক ঘরে শুতাম। দুটো আলাদা খাট। দাদার বয়স তখন বারো। দাদার নাম অরণ্য, ডাকনাম রণ। আর আমার একটা নাম রাধারানি আর একটা নাম রেবেকা, ডাকনাম জুলি।

তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি আকাশে। বড় বড় তুলোর মণ্ডের মতন অন্ধকার সরে সরে যাচ্ছে। মোরগরা ডিউটি দিতে শুরু করেনি। আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে একটা বারান্দা, তার পাশের ঘরটার একটা দেওয়াল ফাটা, অনেকটা ফাটা, বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকে আসে তাই সেখানে শুধু মালপত্র রাখা হয়, তারপর মায়েদের ঘর, সামনের দিকে একটা ছাদ, তার এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে।

মায়ের ঘরে বড়পিসিমাও শোন, পাশের খাটে। বড়পিসিমার খুব হাঁপানির অসুখ, তিনি মাত্র এক মাস আগে এসেছেন। যখন হাঁপানি বেড়ে যায়, তখন তিনি বিছানার ওপর উঠে বসে এমন ধড়ফড় করেন যে, দেখলে ভয় লাগে। তখন তাঁকে নানারকম সেবাযত্ন করতে হয়। তিনি নিজে নিজে হাঁটতেও পারেন না, ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়।

বড়পিসিমা মানে বাবার বড় দিদি, অসুস্থ হলেও তাঁর খুব

BanglaBook.org

ব্যক্তিত্ব। একমাত্র তিনিই আমার বাবাকে খোকন বলে ডাকতে পারেন। অথচ মাকে তিনি ডাকেন স্বর্ণমঞ্জরী। যদিও মোটেও মা'র নাম স্বর্ণমঞ্জরী নয়, আমরা জানি মায়ের নাম বসুধা, ডাকনাম সুধা। এই পরিবারে এককালে প্রথা ছিল, বাড়িতে নতুন বউ এলে তার বাপের বাড়ির নামটা মুছে ফেলে একটা নতুন নাম দেওয়া হত। সেসব প্রথা কবে চুকেবুকে গেছে। বড়পিসিমা নিজেই মায়ের ওই নাম দিয়েছিলেন, তিনি ছাড়া আর বিশেষ কেউ সে নাম মনে রাখেনি। এ বাড়ির সবার কাছে মা সুধাবউদি।

দিনের বেলা রতনের মা নামে একজন বড়পিসিমার দেখাশুনো করে। রাত্তিরে নিজেই এই ভার নিয়েছে মা।

মাকে ডাকতে গেলে যে বড়পিসিমাকেও জাগিয়ে তোলা হবে, সে কথাটা আমার প্রথমে মনে আসেনি। ভোরের দিকেই তাঁর ভালো ঘুম হয়, কারণ তিনি আফিম খান।

মায়ের ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েও আমি থেমে গেলাম।

থামলাম অন্য কারণে।

তখনই আমার চোখে পড়ল, পাশের ছাদে দুটি ছায়ামূর্তি। একজন অবশ্যই আমার মা, অন্যজন একজন পুরুষ। এরা পরস্পরকে চুমো খাচ্ছে। চুমো খেতে খেতে তারা ধপাস করে পড়ে গেল।

এই দৃশ্য যে বেশিক্ষণ দেখা উচিত নয়, কিংবা সাড়া দিতে নেই, তা আমার তক্ষুনি মনে হল। কে শিখিয়েছে তা জানি না। আমি ইচ্ছে করলেই আর একটু এগিয়ে উঁকি মেরে ওদের দেখতে পেতাম, বরং মুখ ঢেকে ছুট্টে পালিয়ে এলাম নিজেদের ঘরে।

সেই বয়সে আমি একটা সরল বোকাসোকা মেয়ে ছিলাম।

BanglaBook.org

আমার বয়সিই কোনও কোনও মেয়ে বেশ পাকা হত। নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্ক বিষয়ে আমার তখনও কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কেমন যেন একটা রহস্যময় অস্পষ্টতা। এর আগেও আমি এরকম দু'-একটা ব্যাপার দেখে ফেলেছি, যেমন সুতপাদি আর নিপুকার আদর, কিন্তু তা আমার মনে হয়েছে বড়দের অসভ্য অসভ্য খেলা। ছোটদের ওসব খেলতে নেই।

বাবা এখন দিল্লিতে। মায়ের সঙ্গে অন্য একজন পুরুষের ওই খেলার মধ্যে যে কিছু একটা বিসদৃশ ব্যাপার আছে, তা আমাকে কেউ বলে না দিলেও কী করে বুঝলাম!

বুকের মধ্যে ধকধক করছে, তলপেটে সেই ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে। এখন কী করি?

ওই বয়সে অনেক ব্যাপারেই নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জন্মায় না। মা সব ঠিক করে দেয়। এখন মায়ের কাছে যাওয়া যাবে না।

আমি দাদার বিছানার পাশে বসে পড়ে তাকে ধাক্কা দিতে দিতে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলাম, দাদা, এই দাদা...

দু'বার ডাকতেই চোখ মেলে তাকাল আমার থেকে আড়াই বছরের বড় দাদা। সেই বয়সেই তার স্বভাবে খানিকটা গাম্ভীর্য এসেছিল। অনেকটা বাবার মতন।

দু'বার ডাকার পরেই দাদা চোখ মেলল। তার দৃষ্টিতে বিরক্তি বা অপ্রসন্নতা নেই বিন্দুমাত্র। আমার ব্যাকুলতা দেখেও দাদা তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হল না। শান্তভাবে বলল, কী হয়েছে রে জুলি?

আমি আবার শুধু বললাম, দাদা, দাদা...

সেই মুহূর্তে আমি বুঝলাম, মায়ের কথাটা দাদাকে বলা ঠিক

BanglaBook.org

হবে না। অন্তত এখন না। আর পেট ব্যথার কথাটাও দাদাকে বলে কী করব! দাদা তো শুনলেই বলবে, যা, মাকে ডাক।

মিথ্যে কথা বানাতে শিখিনি, মুখেই আসে না। আমার চোখমুখ লাল, এই সময় দূরে খুব জোর বুম বুম শব্দ হল।

সেই শব্দই আমাকে বাঁচিয়ে দিল।

আমি বললাম, দাদা, কামানের আওয়াজ।

আরও তিনবার সেই শব্দ দাদা কান খাড়া করে শুনে বলল, হ্যাঁ। হাউটজার। তুই ভয় পাচ্ছিস নাকি?

আমার তখন এই ভয়ের অনুভূতিটা নেই। শরীরের যন্ত্রণাটাই আসল।

দাদা বলল, ভয় নেই। অনেক দূরে। আমাদের জয়েন্ট ফোর্স অ্যাডভান্স করছে। যা, শুয়ে পড়।

দাদা চোখ বুজল পাশ ফিরে।

আমি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম একটুক্ষণ। জানলা দিয়ে এখন অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দুটো আমগাছের মাঝখানে একটা জামরুলগাছ। অরুণ বর্ণ হচ্ছে এক দিকের আকাশ। দুটো দুর্গাটুনটুনি ডাক শুরু করেছে।

আমার বয়স যদি তখন আর একটু কম হত, তা হলে মায়ের কাছে আর একজন মানুষ থাক বা না থাক, মায়ের কাছেই ছুটে যেতাম ব্যথার কথা বলার জন্য। কিন্তু এই সময় যে যাওয়া চলে না কিংবা দাদাকেও এই কথা বলা ঠিক নয়, এই বোধের উদয় হয়েছিল তলপেটের ব্যথাটার কারণেই। এই উপলব্ধি আমার হয়েছে বেশ কিছুদিন পর।

আমি এসে বসলাম বিছানার এক পাশে। শীত লাগছে ঠিকই, কিন্তু গরম জামা গায়ে দিচ্ছি না, লেপটাও তুলে নিচ্ছি না।

BanglaBook.org

বসে বসেও কি মানুষ স্বপ্ন দেখে?

সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম, আমি বাবার হাত ধরে বেড়াচ্ছি একটা নদীর ধারে। সেখানে আর কেউ নেই। সামনেই একটা পাহাড়। এরকম বিচ্ছিরি পাহাড় আমি আগে কখনও দেখিনি। নদীটা যেমন সুন্দর, টলটলে জলে ডুবছে আর উঠছে তিনটে হাঁস, পাহাড়টা তেমনই কুৎসিত। শুধু মোটা মোটা এবড়োখেবড়ো পাথর, গাছপালা দূরের কথা, এক টুকরো ঘাসও নেই সে পাহাড়ে।

নদীর ধার ছেড়ে বাবা সেই পাহাড়ের দিকে এগোতেই আমি বললাম, ওদিকে যাব না। ওদিকটা ভাল না।

বাবা স্নিগ্ধ গলায় বললেন, হ্যাঁ রে, এখন আমরা এদিকেই যাব।

আমি আবদার করে বললাম, না, বাবা, নদীটার পাশে চলো।

বাবা বললেন, না রে খুকি, এই পাহাড়টা আমাদের পার হতেই হবে।

চটি পরা পায়ে সেই পাথর টপকে টপকে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে একটু বাদেই আমি আছাড় খেয়ে পড়লাম। লাগল বেশ জোরে। রক্ত বেরুতে লাগল হাঁটু দিয়ে।

তারপরই ঘোর ভেঙে গেল। পাহাড় কোথায়? আমি বসে আছি আমার বিছানার এক পাশে। অথচ এত সত্যি মনে হচ্ছিল।

হাত দিয়ে দেখলাম, হাঁটুতে না, আমার উরুর কাছে রক্ত গড়াচ্ছে। দৌড়ে চলে গেলাম বাথরুমে।

সেই দিনই আমি শৈশব ছেড়ে প্রবেশ করলাম কৈশোরে।

BanglaBook.org

দুই

কবুতরহাটি গ্রামের প্রায় পাশেই রীতিমতন একটা যুদ্ধ চলেছে। সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত মাত্র এগারো মাইল দূরে।

ডিসেম্বরের সাত তারিখ, উনিশশো একাত্তর। তখনও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নৃশংসভাবে নিজের দেশের মানুষদেরই মেরে চলেছে। তাদের ধারণা, এইভাবেই অত্যাচার করে, বাড়িঘর পুড়িয়ে, নারীদের বলাৎকার ও শিশুদেরও সর্বনাশ করে তারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের চিরকাল দমিয়ে রাখবে। অকারণ এই রক্তক্ষয় ও মানবতার অপমান।

ছোট্ট গ্রামটিতে এখন প্রচুর মানুষ। ঢাকায় ২৫ মার্চ গোলাগুলি চলার পর থেকেই মানুষ পালাতে শুরু করে। শহর ছেড়ে কেউ কেউ গেছে নিজেদের গ্রামে, আর যেসব গ্রামেও অত্যাচার শুরু হয়েছিল, সেখানকার মানুষ শরণার্থী হয়ে চলে আসে ভারতে, মূলত পশ্চিম বাংলা, অসম ও মেঘালয় রাজ্যে। গোড়ার দিকে তাদের জন্য শরণার্থী শিবির স্থাপিত হয়েছিল, তারপর তাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সব লন্ডভন্ড হয়ে যায়। যে যেখানে পারে, একটা তাঁবু খাটিয়ে আস্তানা গড়ে নিয়েছে, অনেকের তাঁবু খাটাবারও সামর্থ্য নেই, হোগলা কিংবা চ্যাচার বেড়া দিয়ে মাথা গুঁজে রয়েছে কোনওরকমে।

এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোনও ভেদাভেদ নেই।

তা ছাড়া এখানে গড়ে উঠেছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় শিবির। দিন-রাত তরুণ সেনানীরা আসা-যাওয়া করছে। স্থানীয় মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের বলে শুধু মুক্তি। মুক্তিদের সবাই খাতির

BanglaBook.org

করে, গৃহস্থরা বাড়িতে ডেকে খাবারও খাওয়ায়।

বহরমপুরে ভারতীয় সৈন্যদের মস্ত ঘাঁটি, তাই এদিকের সীমান্ত থেকে পাক বাহিনীকে ডিসেম্বরের ছ'-সাত তারিখের মধ্যেই অনেকটা ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু তারা ফিরে ফিরে আসে।

এ গ্রামে পাকা বাড়ি বিশেষ নেই। তার মধ্যে দত্তদের শিব নিবাস জগদ্দলের মতন দাঁড়িয়ে আছে। দত্তরা এককালে জমিদার ছিল ঠিকই, তবে বিশেষ কিছু না, মুর্শিদাবাদ ক্রনিক্‌লে তাদের কথা মাত্র তিন লাইনে সেরে ফেলা হয়েছে। মোট কথা, এত বড় তিন মহলা বাড়ির উপযুক্ত ছিল না দত্তরা, তবু এই বংশের কোনও একজনের উৎকট শখ হয়েছিল। এখন শুধু বাড়িটিই আছে, তার কোনও মহিমা নেই, কত যে শরিকে ভাগ হয়ে গেছে ঘরগুলি তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। এদের মধ্যে সকলেই শরিক কি না তাই-ই বা কে জানে, এই প্রশ্ন নিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে প্রায়ই এমন ভাষায় বিবাদ হয়, যা মোটেই জমিদারোচিত নয়।

শুধু দোতলার দুটি মহল আলাদা করে রাখা আছে। দুই ভাই বীরেশ্বর ও সুরেশ্বর দত্তর। দু'জনেরই আলাদা ফ্ল্যাট আছে কলকাতায়, ছেলেমেয়েরাও কেউ এ গ্রামে থাকে না। সুরেশ্বরের গোটাকতক ট্যাক্সি আছে, বীরেশ্বর কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বর্তমানে মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি।

তেসরা ডিসেম্বর রাত্রি থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই বীরেশ্বরের কাঁধে গুরুদায়িত্ব চেপেছে। কোথা থেকে সৈন্য কখন কোন দিকে দ্রুত পাঠিয়ে দিতে হবে, এই ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। যদিও তিনি কখনও সামরিক উর্দি অঙ্গে ধারণ করেননি, অস্ত্র

BanglaBook.org

চালনারও অভিজ্ঞতা নেই। তবু তিনি যেন একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি। স্বয়ং জেনারেল মানেক শ' প্রায়ই পরামর্শ করেন তাঁর সঙ্গে।

বীরেশ্বর দত্তের আর একটি গুণ, তিনি স্বল্পভাষী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে তিনি পছন্দই করেন না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধীর সামনে গেলেই অনেকের মুখ একেবারে গদগদ কিংবা তেলতেলে হয়ে যায়, কেউ কেউ ভক্তিতে নুয়ে পড়ে। বীরেশ্বর ওসবের ধার ধারেন না। সহকর্মীদের কাছে তিনি বলেছেন, উনি দেশের ইলেক্টেড প্রধানমন্ত্রী, মহারানিটানি তো নন। আমি সরকারের কর্মী। ওঁকে ভয় কিংবা ভক্তির তো প্রশ্ন নেই।

এ কথাগুলি ইন্দিরা গাঁধীর কানে গিয়েছিল কি না জানা যায় না, তবে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বেশ পছন্দ করেন। পাকিস্তানের সঙ্গে তো যুদ্ধ ঘোষিত হল তেসরা ডিসেম্বর, কিন্তু তার কয়েক মাস আগে থেকেই সে-দেশের মধ্যে চলছে অঘোষিত যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর সংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে ভারতে।

মানুষ সহজে নিজের বসতবাড়ি ছেড়ে দেশান্তরী হতে চায় না। মানুষের প্রকৃতিই ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকা। তবু যে এত মানুষ আসছে, তাতেই বোঝা যায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সেনাবাহিনীর অত্যাচার কোন চরম জায়গায় পৌঁছেছে।

এই শরণার্থীরা অধিকাংশই গরিব। যারা মোটামুটি সচ্ছল ও শিক্ষিত, তারা আশ্রয় নিয়েছে শহরে। আর এই ত্রাণশিবিরের মানুষগুলি অসহায়, উদ্‌ভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত। কতদিন এইভাবে থাকতে হবে, ভবিষ্যতে কোথায় যাবে, কিছুই জানে না।

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই উদ্বাস্তুর সংখ্যা সত্তর লক্ষ হয়ে গেল। আরও যে কত বাড়ছে, তার ঠিক নেই। এত বিপুল সংখ্যক

BanglaBook.org

মানুষের খাদ্য জোগানো ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার সাধ্য সরকারের নেই। অনেক জায়গায় সরকারি ত্রাণশিবির খোলা হলেও প্রচুর বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে এল। যেহেতু উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, তাই সব দিক সামলাতে সকলেরই হিমসিম অবস্থা।

এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী চলে এলেন পশ্চিমবঙ্গে।

পেট্রাপোল রেল স্টেশনটি অনেকদিন অব্যবহৃত। একসময় এই ট্রেন লাইন দিয়ে কলকাতা থেকে সরাসরি খুলনা-যশোর যাওয়া যেত। এখন সেই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম জুড়ে উদ্বাস্তুদের আস্তানা। সেখানেও কুলোচ্ছে না, নতুন তাঁবুর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। বিশাল বিশাল হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে খিচুড়ি।

ইন্দিরা গাঁধীকে দেখে অনেকেই ধেয়ে এসে নিজেদের চরম দুঃখের কাহিনি জানাতে চায়। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কয়েকজনের কথা।

তারপর ছোট একটা সদ্য তৈরি করা মঞ্চে উঠে তিনি সবাইকে শান্ত হতে বলে, তাঁর বক্তৃতায় প্রথম দু'-তিনটি বাক্য বললেন বাংলায়। তিনি বললেন, মা, ভাই, বোন ও বন্ধুরা, আপনাদের আমি এই কথাই জানাবার জন্য এসেছি যে, আপনারা সবাই আমাদের অতিথি। অতিথিদের সেবা করাই মানুষের ধর্ম। আমরা কখনওই আপনাদের চলে যেতে বলব না, সীমান্তের দরজাও বন্ধ করে দেব না। তবে আমাদের দেশও তো গরিব দেশ, আপনাদের সেবাযত্নে দোষত্রুটি হতেই পারে। কতদিন চালাতে পারব তাও জানি না। এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা, অন্যান্য বড় বড় দেশগুলির এগিয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু কেউ কোনও দায়িত্ব নিচ্ছে না, এত মানুষ মরছে, তবু কেউ... ইত্যাদি।

BanglaBook.org

আরও দুটি ত্রাণশিবির পরিদর্শন করে ও ভাষণ দিয়ে তিনি অকস্মাৎ এসে পড়লেন কবুতরহাটি গ্রামে।

এটা শুধু বীরেশ্বর দত্তর গ্রাম বলেই নয়, এ গ্রামের ত্রাণশিবিরের প্রশংসা সংবাদপত্রেও ছাপা হয়েছে। এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা, একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, সবচেয়ে বড় কথা এমন পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা আর কোনও ক্যাম্পে আছে কি না সন্দেহ। যে-কোনও জায়গায় হঠাৎ একসঙ্গে বহু লোক এসে থাকতে শুরু করলে স্যানিটেশন সমস্যাটাই প্রধান হয়। এখানে, তাঁবুগুলি থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একটা খালের ধারে সারি সারি টয়লেট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। দু'ঘণ্টা অন্তর ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয় সেখানে।

এই সব কিছু পরিচালনার প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন শ্রীমতী বসুধা দত্ত, সকলের সুধাবউদি। কমিটির চুড়োয় তাঁর নাম থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু শুধু নাম নয়, তিনি দিন-রাত পরিশ্রম করছেন এই কাজে। তিনি স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিজে দেখতে যান, আবার খিচুড়িতে পরিমাণ মতন ডাল দেওয়া হচ্ছে কি না তাও নিজে খেয়ে দেখেন।

হিসেব রক্ষার ব্যাপারটাই সবচেয়ে বড় কাজ। দুঃখের বিষয়, এই ধরনের সেবাকাজেও চুরি হয় অনেক। নানা জায়গা থেকে টাকাপয়সা আসছে, জিনিসপত্র কেনাকাটির ব্যাপারেও তঞ্চকতা করার অনেক সুযোগ। একজন বৃদ্ধ অ্যাকাউন্টেন্ট রাখা হয়েছে যদিও, তবু সুধাবউদি নিজে প্রত্যেকদিন সকাল ও সন্ধেবেলা হিসেবপত্র খুঁটিয়ে দেখেন, তিনি ইকনমিক্সে অনার্স, অঙ্ক ভালোই বোঝেন। সুধাবউদি জানেন, একজনও যদি অসৎ উপায়ে টাকাপয়সা সরাতে শুরু করে, তা কর্মীদের মধ্যে জানাজানি হবেই,

BanglaBook.org

তখন অন্যরাও সুযোগ নিতে শুরু করবে। লোভ জিনিসটাই তো ছোঁয়াচে রোগের মতন।

সুধাবউদির বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশের বেশি নয়। ফরসা রং, সুগঠিত স্বাস্থ্য, মুখখানি দেবী প্রতিমার মতন। তাঁর হাঁটাচলার মধ্যেও বেশ একটা দেবী দেবী ভাব আছে। সবাই তাঁর এমন ভক্ত হয়ে পড়েছে যে তিনি না থাকলে যেন কোনও কাজই সুসম্পন্ন হবে না। সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করে।

ইন্দিরা গাঁধী গাড়ি থেকে নামার পর বসুধা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীমতী গাঁধীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাঁর গায়ের চামড়ায় কাশ্মীরি শুভ্রতার সঙ্গে রয়েছে মসৃণতা। চুলের খানিকটা অংশ সাদা, সেটা শখ করে বানানো হয়েছে না স্বাভাবিক, তা কেউ জানে না। তিনি নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছেন, গায়ে একটা সাদা শাল জড়ানো।

বসুধার সঙ্গে ক্যাম্প অফিসের দিকে যেতে যেতে তিনি বললেন, আপনার স্বামী কিন্তু আমাকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করেননি। অন্যদের মুখে এখানকার ম্যানেজমেন্টের খুব প্রশংসা শুনলাম। আপনি খুব পরিশ্রম করছেন।

বসুধা বললেন, এখানে সবাই খুব খাটছে। টিম স্পিরিটটাই আসল।

তখন দুপুর পৌনে দুটো। প্রথম ব্যাচের খাওয়া হয়ে গেছে, দ্বিতীয় ব্যাচ সদ্য খেতে বসেছে। ইন্দিরা গাঁধী সেদিকে এগোতে এগোতে একটা গামলার মধ্যে রাখা খিচুড়ি দেখে থমকে গেলেন। ভুরু তুলে বললেন, খিচুড়ি? কতদিন খাইনি। সেই শান্তিনিকেতনে... আমার বাড়িতে কেউ বাঙালিদের মতন খিচুড়ি রাঁধতে জানে না।

banglabook.org

বসুধা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একটু খাবেন? ছোট বাটিতে তুলে দেব?

ইন্দিরা দু'দিকে মাথা নেড়ে হতাশভাবে বললেন, নো। থ্যাঙ্ক ইউ। আমার বাইরের কিছু খাওয়া নিষেধ।

খেতে বসা লোকগুলি ইন্দিরাকে দেখে জয় বাংলা, ইন্দিরা গাঁধী জিন্দাবাদ, ভারত-বাংলা মৈত্রী জিন্দাবাদ—এরকম আরও অনেক রকম স্লোগান দিচ্ছে। একটি যুবক উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, স্বাধীন বাংলা সরকারকে ভারত কবে স্বীকৃতি দেবে?

প্রধানমন্ত্রিত্ব করতে গেলে কত কিছু শিখতে হয়। কী অসাধারণ সংযম! তিনি যুবকটির দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন, মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই, যেন ওই চেয়ে থাকাটাই তাঁর উত্তর। তারপর যেন তিনি কিছুই শুনতে পাননি এইভাবে আবার এগিয়ে যেতে যেতে বসুধাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ক'টি ছেলেমেয়ে?

বেশি সময় নেই, এখান থেকে গাড়িতে বহরমপুর গিয়ে তারপর প্রধানমন্ত্রীকে হেলিকপ্টারে উঠতে হবে। সেখান থেকে দমদম এয়ারপোর্ট। তিনি দত্তবাড়িতে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে, বসুধা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলালেন। বীরেশ্বর সরকারি কর্মী বলে নিজে সে ছবির অন্তর্গত হতে চাইলেন না।

ইন্দিরা গাঁধীর এই ঝটিকা সফরের ফলে কবুতরহাটি ক্যাম্পের গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেল। পরদিনই সরকারি অফিসাররা এসে মাপজোক করে সেই ত্রাণশিবির আরও অনেকখানি বাড়াবার পরিকল্পনা করে ফেলল এবং টাকাপয়সা ও বাঁশ-তাঁবু,

BanglaBook.org

অন্যান্য জিনিসপত্র আসতে লাগল অনেক। বসুধা দত্ত ত্রাণ কমিটির সভাপতি হিসেবে ছাঁটাই করলেন কিছু কিছু সরকারি উদ্যোগ। এখানে কোনও কিছুই তাঁর মতামত না নিয়ে চালু করা যায় না।

তিন

একজন পাকিস্তানি সৈন্য জ্যান্ত অবস্থায় ধরা পড়েছে যৌথবাহিনীর হাতে। সীমান্তের ওপার থেকে খালে একটা নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে এদিকে, তাকে দেখার জন্য দলে দলে মানুষ ছুটে যাচ্ছে খালধারে।

পাকিস্তানি সেনাদের এখানে সবাই বলে খানসেনা। লড়াইটাই তো হচ্ছে শেখ বনাম খানের মধ্যে। শেখ মুজিবর রহমান আর জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

কতরকম যে বীভৎস কাহিনি এই খানসেনাদের নামে রটেছে এর মধ্যে।

লুঠতরাজ, নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ ছাড়াও এরা নাকি শিশুদের শূন্যে ছুড়ে দিয়ে তারপর হাসতে হাসতে গুলি করে। কোনও বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখলেই সে-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এমনকী মৌলানা ভাসানির ছবি দেখেও তারা ভুল করে রবীন্দ্রনাথ ভাবে।

যুদ্ধের সময় এরকম অনেক কাহিনিই রটে। তার মধ্যে কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যে তা বলা দুষ্কর।

এই সৈনিকটির বয়েস আঠারো-উনিশের বেশি নয়, মুখ

BanglaBook.org

থেকে এখনও কৈশোরের লাবণ্য মুছে যায়নি। বেশ লম্বা চেহারা, মাথাভরতি চুল, তার দুটি চোখ যেন ভয়ে কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে।

একটা দড়ি দিয়ে তার হাত বাঁধা, সে দাঁড়িয়ে আছে নৌকোর ওপরে। তার পিছনে লাইট মেশিনগান হাতে একজন ভারতীয় সেনা। নৌকোটা ঘাটে ভেড়ার আগেই লোকেরা যা চিৎকার করছে, তার অর্থ একটাই। রক্ত চাই! এক-এক সময় সাধারণ মানুষও রক্তলোলুপ হয়ে ওঠে।

নৌকোটি কাছে আসতেই কিছু লোক লাফিয়ে পড়ে তাকে কেড়ে নিতে চাইল। ভারতীয় সেনাটি তাকে আড়াল করে অস্ত্র তুলে রইল বটে, কিন্তু তার একার পক্ষে বেশিক্ষণ সামলানো সম্ভব হত না। কারণ এখানকার মানুষ জেনে গেছে, একজন পাকিস্তানিকে বাঁচানোর জন্য ভারতীয় সৈন্য নিজের দেশের মানুষের ওপর গুলি চালাবে না।

এই সময় চলে এল রফিক আর মউদুদ। এদেরও কাঁধে ঝুলছে অস্ত্র। এই দু'জনকে সবাই চেনে, এরা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা।

মউদুদ ভারতীয় সেনাটিকে বলল, সর্দারজি, ইসকো হামলোগকা হাত মে দে দিজিয়ে। আউর আপকো দায়িত্ব কুছ নেহি হ্যায়।

সৈনিকটি দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, ইয়ে অর্ডার নেহি হ্যায়।

এদিক ওদিক কিছু পাকিস্তানি ধরা পড়ছে, আত্মসমর্পণও করছে কোথাও কোথাও। ভারতীয় সেনাবাহিনী যাদের জীবন্ত ধরছে, তাদের এক জায়গায় রেখে দিচ্ছে যুদ্ধবন্দি হিসেবে।

আর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা যাদের ধরছে, তাদের নিয়ে কী করছে, তা জানা যায় না। হয়তো প্রতিশোধের জ্বালা মেটাচ্ছে।

BanglaBook.org

রফিক আর মউদুদকে দেখে জনতা আরও উৎসাহিত হয়ে আরও হিংস্র স্লোগান দিতে লাগল।

রফিক হাত তুলে বলল, আপনেরা শান্ত থাকেন। আমাদের এক শত্রু ধরা পড়েছে, আপনাদের সামনেই তার বিচার হবে। গণ আদালত। তারপর ওর একখান একখান করে হাত পা কাটব।

বিচারের আগেই শাস্তি ঘোষণা।

মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা জানে, ইন্ডিয়ান আর্মির লোকটি তাদের সঙ্গে তর্ক করলেও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে না।

তাই ছেলেটিকে কেড়ে নেওয়ার জন্য তারা ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।

বসুধার তখন খালপাড়ে থাকার কথা নয়। নতুন কয়েকটা ল্যাট্রিন তৈরি করতে হবে, সেই ব্যাপারে জায়গা নির্বাচনের জন্য তিনি কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে ঘুরছেন। খেয়াঘাটে গোলমাল শুনে তিনি দেখতে গেলেন।

খানসেনাটিকে দেখে তিনি চমকে গেলেন। মানুষের এমন ভয়ার্ত, পাংশু, অসহায় মুখ তিনি আগে কখনও দেখেননি। ভাষা না জানলেও সে বুঝে গেছে যে তার মৃত্যু অতি আসন্ন।

বসুধা একেবারে ঘাটের কাছে নেমে গিয়ে বললেন, এই দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে কী হয়েছে, শুনি।

সংক্ষেপে বৃত্তান্তটি জেনে তিনি বললেন, মউদুদ, ওকে ছেড়ে দাও। ইন্ডিয়ান আর্মির হাতে ধরা পড়েছে, ও প্রিজনার অফ ওয়ার। জেনিভা কনভেনশন অনুযায়ী ওর বিচার হবে। তার আগে কেউ ওর গায়ে হাত তুলতে পারবে না।

এ কথা ওখানে অনেকে বুঝতে না পারলেও রফিক আর মউদুদ হেসে উঠল।

BanglaBook.org

রফিক বলল, আপনি কন কী ভাবী! জেনিভা এখান থিকা অনেক দূর। এই হারামজাদারা সেসব কিচ্ছু মানে? শত্রুরে বন্দি রাখবে, খাওয়াবে-দাওয়াবে, এসবের ওরা ধার ধারে না। সঙ্গে সঙ্গে খুন করে আর সেই লাশগুলি ওরা গোরও দেয় না। আর আমাগো কাউরে যদি হাতে পায়...

মউদুদ বলল, ওরে আমাদের হাতে ছেড়ে দেন। আমরা সবার সামনে ওকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব!

বসুধা বললেন, ছেলেটা থরথর করে কাঁপছে। খুব সম্ভবত ওর খুব জ্বর হয়েছে। কত কম বয়স, হয়তো নতুন জয়েন করেছে আর্মিতে।

মউদুদ বলল, ওসব কথা ছাড়েন তো ভাবী! এখন একটা ওয়ার চলতাছে, এখন ওসব প্রশ্নই ওঠে না। এই পাক আর্মিটা আমারে সামনে পেলে ছাড়ত? ওরা যে কী বীভৎস অত্যাচার করে, তা আমি আপনার সামনে উচ্চারণও করতে পারব না।

মনিরুল আর স্বপন নামে আর দু'জন দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা দূরে। ওরা মাঝে মাঝেই বসুধার কাছে আসে। এখন অবশ্য ওরা এই কাণ্ডে কোনও অংশ নিল না।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এসে আগুন ছেটানো গলায় বলল, এরা আমাগো গ্রাম জ্বালাইয়া দিছে। আমার নিজের বোন...

আর একজন বলল, আমার মায়ের ইজ্জত...

বসুধা হাত তুলে বললেন, ওরা হয়তো নানারকম বর্বরতা করে থাকতে পারে, তা বলে আমরা আমাদের মনুষ্যত্ববোধ হারাব কেন? একটা অল্পবয়সি ছেলে, জ্বরে কাঁপছে, তাকে মেরে আপনাদের জ্বালা মিটবে? না, আমি তা হতে দেব না।

BanglaBook.org

পুলিশের কোনও কর্তা কিংবা কোনও ম্যাজিস্ট্রেট এসেও এ কথা বললে, জনতা মেনে নিত কি না সন্দেহ। কিন্তু সুধাবউদির কথা অগ্রাহ্য করা এ অঞ্চলে সম্ভব নয়।

বসুধা ধমকের সুরে বললেন, মউদুদ, ওকে ছেড়ে দাও।

আর ভারতীয় সেনানীটিকে বললেন, ইনকো লে চলিয়ে।

সে খানসেনাটির কাঁধের কাছের শার্ট চেপে ধরে ঠেলতে লাগল। বিভক্ত জনতার মধ্য দিয়ে বসুধা তাকে নিয়ে চললেন।

ছেলেটিকে তিনি রাখবেন কোথায়? এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা যৎসামান্য, একটা সেন্টার খোলা হয়েছে বটে, তাও ডাক্তার রোজ আসে না, দু'জন কম্পাউন্ডারই চালায়। তা ছাড়া বন্দিকে পাহারা দেওয়ারও ব্যাপার আছে।

বড় হাসপাতাল আছে বহরমপুরে। কঠিন রোগীদের পাঠানো হয় সেখানে। এই শীতের সময়ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে খুব। আজও আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এখন গাড়ি জোগাড় করে ওকে সন্ধের আগে বহরমপুরে পাঠানো খুবই কঠিন।

সুধাবউদি ওকে দত্তবাড়িতেই নিয়ে যেতে বললেন।

দত্তবাড়ি আকারে বড় হলেও এখন সেখানে কণামাত্র স্থান নেই। ঘরগুলো তো জবরদখল হয়ে গেছে আগেই, এখন ওপারের শরণার্থীদের মধ্যে কয়েকজন এই পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করেছে। তারা তো সাধারণ উদ্বাস্তুদের মতন ত্রাণশিবিরে অন্যান্যদের সঙ্গে মাথা গুঁজে থাকতে পারে না। সুতরাং সব বারান্দা ও সিঁড়ির তলাও তারা দখল করে নিয়েছে।

পুরনো আমলের একটা আস্তাবল তালাবন্ধ ছিল এতকাল। সেটা কেউ খুলতে পারেনি। বসুধা সেই ঘরটা খুলিয়ে দেখলেন, তার ভেতরটা জিনিসপত্র ও পোকামাকড়ে ঠাসা।

BanglaBook.org

উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাদের একটু স্বাস্থ্য ভালো, তাদের সুধাবউদি নানারকম কাজে লাগান। সেইরকমই চারজনকে ডেকে এক ঘণ্টার মধ্যে সেই ঘর সাফ করে ফেলা হল। তারপর সেখানে পাতা হল একটা শতরঞ্চি।

ছেলেটি থরথর করে কাঁপছে আর বিড়বিড় করে কী যেন বলতে শুরু করেছে। সম্ভবত মাকে ডাকছে। চূড়ান্ত বিপদে পড়লে তো ছেলেরা অনুপস্থিত মাকেই ডাকে।

ছেলেটিকে শুইয়ে দেওয়ার আগে ওর হাতের বাঁধন খুলিয়ে দিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, তার নাম কী?

চারবার একই প্রশ্ন করাতেও সে উত্তর দিল না। তুমহারা নাম কেয়া, এই ভাষায় হিন্দি ও উর্দুতে বিশেষ কিছু তফাত নেই, তাও সে বোঝে না?

কম্পাউন্ডারবাবুদের খবর দিতে বলে সুধাবউদি এক বাটি গরম দুধ এনে ওকে খাওয়াতে গেলেন। তাও সে প্রথমে খেতে চায় না। তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে নরমভাবে বলতে লাগলেন, পি লিজিয়ে, পি লিজিয়ে।

তখনই তিনি টের পেলেন, কী সাংঘাতিক উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে ছেলেটির। ডেঙ্গু? শোনা যাচ্ছে এরকম একটা রোগের কথা। তাতে জ্বর অত্যন্ত বেশি হয়, মারাও যায় কেউ কেউ।

একটু পরে অবশ্য ছেলেটি চুকচুক করে দুধটা সবই খেয়ে নিল। তার মধ্যেই এসে পৌঁছোলেন আর্মি অফিসার, ব্রিগেডিয়ার মোহন ভার্মা।

অত্যন্ত ভদ্র গলায় তিনি হিন্দিতে বললেন, ম্যাডামজি, কাজটা আপনি ঠিক করেননি। খুব রিস্কি ছিল।

বসুধা বললেন, রিস্কি? কীসের রিস্ক ছিল?

BanglaBook.org

মোহন বললেন, আমি সব রিপোর্ট পেয়েছি। মুক্তির ছেলেরা ওকে নিজেদের কাস্টডিতে নিয়ে নিতে চাইছিল, আর রিফিউজিদের মধ্যে যারা নিজেদের আপনজনদের হারিয়েছে, তারাও চাইছিল ওকে প্রকাশ্যে শাস্তি দিতে। তাদের মাঝখান দিয়ে আপনি ওকে নিয়ে চলে এলেন, সেটা রিস্ক নয়? যদি ওই অ্যাংরি লোকজন সব ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিত? আপনাকে এখানে সবাই মানে তা জানি, তবু এক-একটা সময়, একজন লোকও যদি...

বসুধা বললেন, তা বলে বিনা বিচারে লোকে ওকে লিন্চ করবে? আমরা কি সভ্য দেশে বাস করি না? কোথাও কোথাও এরকম ঘটেছে শুনেছি, কিন্তু আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি হারাব কেন?

মোহন বললেন, ভাবীজি, যাদের ছেলেকে পাক আর্মি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে, কিংবা যে-লোকের সামনে তার স্ত্রীকে রেপ করা হয়েছে, এদের বুকের মধ্যে যে কী আগুন জ্বলছে, তা আপনি বা আমি ঠিক বুঝতে পারব না। যুদ্ধের সময় সভ্য দেশের অনেক নিয়মই খাটে না। যুদ্ধ জিনিসটাই তো বর্বরতা। যদি লোকেরা আপনার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিত, তারপর ওর হাত-পা ছিঁড়ত, তখন আপনার মনের অবস্থা কীরকম হত? আপনি হয়তো আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতেই পারতেন না। সেটাই বেশি বিপদের হত।

বসুধা বললেন, কী জানি, আমি তো আর অতশত ভাবিনি। আমার মনে হয়েছিল, অল্পবয়সি একটা ছেলে, সে যে-দেশেরই মানুষ হোক না, তাকে বাঁচার একটা সুযোগ নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। খানসেনাদের যত সব অত্যাচারের গল্প শুনি, এ ছেলেটা,

BanglaBook.org

এমন সরল ওর মুখখানা, এ নিশ্চয়ই সেরকম কিছু করেনি।

মোহন হেসে বললেন, আপনার কোমল মন, আপনি তাই একথা ভাবছেন। আর্মিতে সবার দায়িত্ব সমান। আর অল্পবয়সিদের দিয়েই সবচেয়ে বেশি নোংরা কাজ করানো হয়।

এ ছেলেটা ওর ব্যাটেলিয়ন থেকে ছিটকে গিয়েছিল, সম্ভবত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল, ডেজার্টারও হতে পারে, ভয় পেয়ে পালাতে চাইছিল? সেটা খুবই বোকামি, এই পূর্ব বাংলার নদী-নালার দেশে ও কোথায় পালাবে? ওর নিজের আর্মির চোখে পড়ে গেলে তখনই ওকে গুলি করে মেরে ফেলা হত। প্রথমে মুক্তির ছেলেরা ওকে স্পট করে, তাদের দেখে ও ভয় পেয়ে দু'হাত তুলে আমাদের আর্মির কাছে চলে এসে আর্মস নামিয়ে রাখে। ওর নাম রহমৎউল্লাহ বা এই ধরনের কিছু, সহজে বলতে চায় না, ওর ভাষাও বোঝা যায় না।

ছেলেটা দুধের পাত্রটা হাতে নিয়ে, বিছানার ওপর বসে ওঁদের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে।

দরজার কাছে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে। মোহন ভার্মার সঙ্গে আরও চারজন আর্মির লোক এসেছে, তারা সামলাচ্ছে ভিড়। এর মধ্যেই রণ আর জুলি ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের পাশে।

মোহন বললেন, ওয়েল ভাবীজি, আপনি ছেলেটিকে বাঁচিয়েছেন। আমাদের কাজ বাড়িয়ে দিলেন। ওকে এখন আমাদের বহরমপুরে নিয়ে যেতে হবে।

বসুধা জিজ্ঞেস করলেন, এখন মানে কখন? কাল সকালে?

মোহন বললেন, না, না, ওকে কোনও সিভিলিয়ানের বাড়িতে রাখার নিয়ম নেই। ধরা যখন পড়েছে, তখন আমাদের কোড অফ

BanglaBook.org

কনডাক্ট মেনে চলতেই হবে। আমরা এখনই ওকে নিয়ে যাব।

বসুধা আঁতকে উঠে বললেন, এই সন্ধেবেলা? বৃষ্টি নেমে গেছে। দেখছেন তো ছেলেটা থরথর করে জ্বরে কাঁপছে। আপনাদের তো খোলা জিপ, হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসে। তার মধ্যে এই ছেলেটাকে নিয়ে গেলে...ও তো মরে যাবে!

মোহন এর কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু তাকিয়ে রইলেন বসুধার দিকে।

এর মধ্যে এসে পড়লেন একজন কম্পাউন্ডারবাবু। পুলকেশ আচার্য, বছর পঁয়তিরিশেক বয়স, ছিপছিপে ও সুদর্শন, তাঁর হাবভাব পুরো ডাক্তারের মতন।

হাঁটু গেড়ে বসে তিনি নাড়ি দেখার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেই খানসেনাটি ঝটকা দিয়ে সরিয়ে নিল নিজের হাত।

পুলকেশ তাতে দমলেন না। এরপর তিনি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মুঠো করে ধরলেন ছেলেটির হাত। সেও ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ঝটাপটি করতে লাগল। সেই অবস্থায় কী করে নাড়ি দেখা যায় কে জানে, পুলকেশ একটু বাদে হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, একশো সাড়ে-চার পাঁচ তো হবেই। এত হাই টেম্পারেচার কমাতে না পারলে...

বসুধার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, বউদি, আমাদের কাছে তো সেরকম কিছু ওষুধ নেই। আমরা রিকুইজিশন পাঠিয়েছি। যদি ডেঙ্গু হয়ে থাকে, তা হলে এখন একমাত্র উপায়, একটা পেথিডিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। তাতে ওর ব্যথা কমবে, জ্বরও কমতে পারে।

মোহন উৎসাহিত হয়ে বললেন, সেটাই ভালো। ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারলে আমাদের নিয়ে যেতে সুবিধে হবে।

BanglaBook.org

পুলকেশ তাঁর ওষুধের বাক্স খুলে ইঞ্জেকশন ঠিক করতে লাগলেন।

হঠাৎ ছেলেটি একটা কাতর চিৎকার করে উঠল। একা-একা কুকুরেরা যেরকম শব্দ করে এক-এক সময়। যেন বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা করুণ আর্তনাদ।

বসুধা বললেন, ও কী ভাবছে, আমরা ইঞ্জেকশন দিয়ে ওকে মেরে ফেলব?

মোহন বললেন, সেরকম ভাবতেই পারে।

বসুধা হাত নেড়ে ব্যাকুলভাবে বললেন, ডরো মৎ! ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড।

সে চিৎকার থামাল না।

বসুধা আপন মনে বললেন, এত কম বয়স, ওর নিশ্চয়ই বাবা-মা আছে। তারা জানেও না, ছেলে কোথায়, কীভাবে আছে!

মোহন বললেন, আর্মিতে কারও মা-বাবা থাকে না। এখন মুখোমুখি কমব্যাট চলছে, এখন আমাদের মন্ত্র, কিল অর বি কিলড। মারো অথবা মরো। এ ছেলেটা তো তবু লাকি। জানেন না বোধহয়, গত মাসে হঠাৎ স্নাইপার অ্যাটাকে আমার বাঁ কাঁধে গুলি লাগে। এখনও হাতটা ভালো করে তুলতে পারি না। স্প্লিট সেকেন্ডের এদিক ওদিক হলে বুলেটটা সোজা আমার বুকে লাগত। ম্যাডামজি, আমারও মা আছেন জলন্ধর শহরে।

বসুধা ছেলেমেয়েকে বললেন, তোমরা ওপরে যাও। তোমাদের আর এখানে থাকার দরকার নেই।

রণ বলল, মা, ওই পাকিস্তানিটাকে কি...

তাকে থামিয়ে দিয়ে বসুধা সামান্য ভর্ৎসনার সুরে বললেন, পাকিস্তানিটা আবার কী? আমরা বাংলায় ওইভাবে বলি না।

BanglaBook.org

পুকুরটা, কুকুরটা, গাছটা, থালাটা বলা যায়, কিন্তু মানুষ সম্পর্কে বলতে গেলে, ডাক্তারটি, পাকিস্তানিটি বলতে হয়।

রণ ঘাড় নেড়ে বলল, ওরা অনেক মানুষ মেরেছে, ওকেও মেরে ফেলা হবে?

বসুধা জোর দিয়ে বললেন, মোটেই না। ওসব কথা বলতে নেই। ওর অসুখ, যাতে ওকে বাঁচানো যায়, আমরা সবরকম চেষ্টা করছি। যাও, এখন ওপরে যাও। জুলি, তুই কালকের ফ্রকটাই পরে আছিস? বদলাসনি কেন?

জুলি মায়ের কথার কোনও উত্তর দিল না।

বসুধা বললেন, আজই শোওয়ার সময় বদলে নিবি। গা-আলমারির সেকেন্ড তাকে তোর জামাটামা আছে।

জুলি এবারও কিছু বলল না, তবে দাদার সঙ্গে চলে গেল ওপরে।

খানসেনাটিকে ইঞ্জেকশন দেওয়া মোটেই সহজ হল না। সে একেবারে দাপাদাপি শুরু করে দিল।

পুলকেশ বললেন, দু'-তিনজন মিলে ওকে চেপে না ধরলে তো কিছু করা যাবে না!

মোহন বললেন, ও যেরকম ডেসপারেট হয়ে আছে, কারওর চোখেটোখে চোট লাগিয়ে দিতে পারে। তা হলে আমি ওকে এমনিই নিয়ে যাই।

তিনি বাইরে থেকে নিজের একজন সৈনিককে ডেকে কীসব নির্দেশ দিলেন।

সে কী এক দুর্বোধ্য ভাষায় হুকুম করল খানসেনাটিকে।

সে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মোহন বললেন, আর্মির লোক আর্মির ভাষা বোঝে।

BanglaBook.org

ভারতীয় সৈনিকটি আর একবার আদেশ করতেই সে তার পিছু পিছু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, উঠে পড়ল একটা জিপগাড়িতে।

মোহন বসুধার দিকে তাকিয়ে বললেন, বহরমপুরে হসপিটালে নিয়ে গেলে ওর ভয় অনেকটা কেটে যাবে। যুদ্ধ তো প্রায় শেষ হয়ে এল, ও বাড়ি ফিরেও যেতে পারবে।

বসুধার দু'চোখ সজল হয়ে এসেছে। তিনি মুখটা নিচু করে রইলেন।

মোহনদের গাড়ি ছেড়ে দেবার পর পুলকেশ বললেন, বউদি, আপনার প্রেশারটা দেখে দিই? যন্ত্রটা এনেছি যখন।

বসুধা বললেন, না, না, আমার প্রেশার-ট্রেশার ঠিক আছে।

পুলকেশ বললেন, না, না, আপনি একবার মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন, প্রেশার খুব হাই ছিল।

বসুধা বললেন, সে অমনিই, এখন আমি খুব ভালো আছি।

পুলকেশের ইচ্ছে ছিল, বৃষ্টিভেজা সন্ধেবেলা এসে পড়েছেনই যখন, খানিকটা সময় বসুধার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে যাবেন। বেশ জমিয়ে গল্প করতে পারেন পুলকেশ।

কিন্তু বসুধার এখন সে সময় নেই। প্রেশার মাপাতেও তিনি রাজি হলেন না। উঠে গেলেন ওপরে।

এই সময় পিসিমাকে একটা ওষুধ খাওয়াতে হয়, আর তাঁর নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

বড়পিসিমার নাম মোটেই সেকেলে ধরনের নিস্তারিণী বা কাদম্বরী নয়, বরং বেশ আধুনিক, অনুরাধা। তাঁর শ্বশুরবাড়ি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে, বগুড়ার এক গ্রামে। সেখানে এতদিন তাঁরা ভালোই ছিলেন, এই গন্ডগোল শুরু হওয়ার পর একদিন বাড়িতে বড়রকম ডাকাতি হয়। তাঁর এক দেওরও খুন হয় সেই

রাতে। তারপরই তাঁকে সরিয়ে আনা হয়েছে বাপের বাড়িতে।

হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই, চোখের জোর নেই বলে বইও পড়তে পারেন না, তবু এ গ্রামে কখন কী ঘটছে, তার খবর রাখা চাই। রতনের মাকেই তিনি হাজার প্রশ্ন করেন, কিন্তু রতনের মা সব উত্তর দিতে পারে না, কিংবা অনেক উত্তরই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তাই রাত্তিরে একবার বসুধার কাছে যাচাই করে নেন।

পাশের ঘরে রণ আর জুলি নিজেদের বই খুলে পড়ছে, সে ঘরের দরজার কাছে একবার উঁকি মেরে বসুধা চলে এলেন পিসিমার কাছে।

পিসিমাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা ইজিচেয়ারে, রতনের মা তাঁর পা টিপছে। মুখভরতি পান।

পাশে রাখা একটা বড় ডাবরে পানের পিক ফেলে পিসিমা ভুরু তুলে বললেন, বউমা, আইজ নাকি পাকিস্তানিরা এই গেরামে ঢুকে পড়েছিল?

বসুধা হেসে বললেন, হ্যাঁ, মাত্র একজন। সে আর কত লড়াই করবে বলুন, তাই ধরা পড়ে গেল।

পিসিমা উৎসাহিত হয়ে বললেন, ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে? বেশ হয়েছে! তারপর কী হল?

বসুধা বললেন, তাকে বহরমপুরে আমাদের মিলিটারিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত না করে পিসিমা বললেন, ও। হ্যাঁরে স্বর্ণ, এই বিচ্ছিরি যুদ্ধটা আর কতদিন চলবে রে? পৌষ মাস আইস্যা পড়ল না? পৌষ মাসে কোথাও যাইতে নাই!

বসুধা হেসে বললেন, যুদ্ধ কি পাঁজিকা মেনে চলে? তবে শুনছি তো, যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে আসছে, আর বেশি দেরি নেই।

BanglaBook.org

পিসিমা বললেন, ইন্দিরা গাঁধীরে ক'না, কয়েকখান বোমা ফেলাইতে। তাইলেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।

বসুধা মৃদু হেসে বললেন, কয়েকটা বোমা ফেললেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে? পাকিস্তানেরও তো বোমা আছে!

গভীর বিস্ময়ে পিসিমা বললেন, পাকিস্তানেরও বোমা আছে? কতই বা বয়স, এই তো সেদিন জন্মাইতে দ্যাখলাম।

পিসিমার মুখে এইসব কথা শুনতে ভালো লাগে বসুধার। অদ্ভুত একটা সারল্য আছে, যুক্তি-টুক্তির বালাই নেই।

তিনি সিরিয়াস মুখ করে বললেন, তা পাকিস্তানের বয়স কম হল না পিসিমা। এই ধরুন সাতচল্লিশ থেকে এই একাত্তর—তিন, কুড়ি আর এক, চব্বিশ। চব্বিশ বছর একটা দেশের বয়সের পক্ষে যথেষ্ট।

পিসিমা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, পাকিস্তানিগো দেখতে কেমন? রামায়ণের রাইক্ষসগো মতন?

বসুধা বললেন, আজকে যে-ছেলেটি ধরা পড়েছিল, তার সঙ্গে জয়ন্ত সান্যাল, এখানকার কংগ্রেস নেতা, তার মেজ ছেলে সুশান্তর সঙ্গে খুব মিল। মুখখানা প্রায় একই রকম। পিসি, তোমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে বাঙালি পাকিস্তানিদের দেখোনি? আগে তো আমরা একই দেশের মানুষ ছিলাম।

পিসি ব্যাজার মুখে বললেন, এক ছিলাম, তাইলে দুই হইলাম ক্যান? আর দুই হইলামই যদি, তাইলে আবার যুদ্ধ-মুদ্ধ হয় ক্যান?

বসুধা স্মিত মুখে তাকিয়ে রইলেন। এ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং ভগবানও কি দিতে পারবেন?

পাশের ঘরে জুলি তখনও বই পড়ে যাচ্ছে, আর রণ একটা

BanglaBook.org

খেলনা বন্দুক নিয়ে খেলছে।

সারাদিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখাই হয় না প্রায়। রাত্তিরবেলা তিনজন একসঙ্গে খেতে বসে, এটাই ওদের সঙ্গে গল্প করার সময়।

বসুধা জিজ্ঞেস করলেন, কী বই পড়ছিস রে জুলি?

জুলি উত্তর দিল না।

বসুধা উঁকি মেরে দেখলেন, অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট-এর বাংলা অনুবাদ।

তিনি বললেন, একী, তুই ফ্রকটা এখনও চেঞ্জ করিসনি? তোকে তখন বললাম না?

জুলি এবারও উত্তর দিল না, চোখ তুলল না বইয়ের পাতা থেকে।

রণ বলল, মা, জানো তো, টাঙ্গাইল গ্যারিসন গো ওয়েস্ট গন!

বসুধা দেওয়াল আলমারির পাল্লা খুলে জুলির জন্য ফ্রক খুঁজতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন, ছোটবেলাতে গল্পের বই শুরু করলে আমাদেরও তো আর কোনও কিছুর জ্ঞান থাকত না। অল কোয়ায়েট বইখানা তিনি স্কুলে পড়ার সময় প্রাইজ পেয়েছিলেন। এখনও পড়তে শুরু করলে ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

একটা সাদা-কালো ফ্রক নির্বাচন করে বসুধা বললেন, নে জুলি, ফ্রকটা বাথরুমে গিয়ে বদলে নে। তারপর আমরা খেতে বসব।

জুলি বলল, না।

বসুধা অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বদলাবি না? কেন?

জুলি বলল, এমনিই।

BanglaBook.org

বসুধা এবার একটু শাসনের সুরে বললেন, এমনি আবার কী? ওই নোংরা, বিচ্ছিরি ফ্রকটা কাল থেকে পরে আছিস, তোর ঘেন্না করে না? নে, ওঠ, বইটা এখন রাখ।

জুলি বেশ চেঁচিয়ে বলল, না, আমি বদলাব না!

ছেলে ইদানীং একটু একটু অবাধ্য হয়ে উঠছে, কিন্তু মেয়ে খুব শান্ত আর মায়ের সব কথা শোনে। তার আবার কী হল?

বসুধা আপন মনে বললেন, আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকি, দেখছিস তো, এত মানুষ, তাদের কত কষ্ট...। আমি ভেবেছিলাম, তোরা এখন বড় হয়েছিস, নিজেদের জামাকাপড় নিজেরাই ঠিক করে নিবি। আমি আর তা হলে রাত্তিরে কিছু খাব না।

রণ বলল, এই জুলি, তাড়াতাড়ি ফ্রকটা বদলে হাত ধুয়ে আয় না! আমার খিদে পেয়েছে।

জুলি এবার উঠে গিয়ে দড়াম শব্দে বন্ধ করল বাথরুমের দরজা।

বসুধা রতনের মাকে ডেকে খাবারের কথা বললেন। এখন ওপরেই একটা রান্নাঘরে তাঁদের জন্য আলাদা খাবার হয়।

জুলি বেরিয়ে আসার পর তিনি নিজেও গেলেন হাতমুখ ধুয়ে ঘাড়ে একটু জল দিয়ে আসতে। টিমটিম করে জ্বলছে আলো, কখন অন্ধকার হয়ে যাবে ঠিক নেই।

জুলির ফ্রকটা বেসিনের তলায় পড়ে আছে। সেটা তুলে ঠিকমতন রাখতে গিয়ে দেখতে পেলেন তাতে ছিটে ছিটে রক্ত লেগে আছে। ভুরু কুঁচকে তিনি একটুক্ষণ দেখলেন, তারপরই ছুটে বেরিয়ে এসে জুলিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আহা রে, সোনা রে, কবে হয়েছে? আমাকে বলিসনি কেন? এইসব কথা মাকে বলতে হয়। ভয় নেই।

জুলি তার শরীরটা শক্ত করে রইল।

BanglaBook.org

চার

যুদ্ধের নবম দিনে নানারকম দুঃসংবাদ শোনা যেতে লাগল। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে প্রথম দিকে পাকিস্তানিদের ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল সব সীমান্ত থেকে। এক-একটা বড় বড় শহরে পাক আর্মির পরাজয়ের খবরে দারুণ উল্লাস হচ্ছিল সর্বত্র। হঠাৎ শোনা গেল, পাক আর্মি আবার বিপুলভাবে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের প্রচণ্ড মারে পিছিয়ে যাচ্ছে যৌথবাহিনী।

কবুতরহাটিতে টেলিফোন নেই। নিয়মিত খবরের কাগজ আসে না। ট্রানজিস্টার রেডিয়ো ভরসা, কিন্তু পাক সীমান্তের এত কাছে বলে কলকাতার চেয়েও ঢাকা বেতারের খবরই বেশি শোনা যায়। তার ফলে গুলিয়ে যায় সত্যি-মিথ্যে।

লোকের মুখে মুখে যেসব কথা রটে, সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলিই বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। হাওয়ায় হাওয়ায় রটে যাচ্ছে যে আবার ধেয়ে আসছে পাক বাহিনী, এই তারা এসে পড়ল বলে। এবার কি তারা ভারতে ঢুকে পড়বে?

এই রটনা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়।

বাষট্টি সালে একবার সীমান্ত নিয়ে সংঘর্ষ হয়ে যাওয়ার ফলে চিন এখন ভারতের শত্রু। ওদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কুড়ি বছরের বন্ধুত্বের চুক্তি করেছে ভারত, তাই জেনে আমেরিকা মুখ বেঁকিয়েছে। আমেরিকা এখন চিনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যস্ত। ভারতের সঙ্গে শত্রুতার ফলেই এখন চিনের সঙ্গে পাকিস্তানের খুব দোস্তি। পাকিস্তানের সাহায্য নিয়েই আমেরিকা ঢুকতে চায় চিনে।

ভারতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা সত্তর-আশি লাখ ছাড়িয়ে গেলে ইন্দিরা

BanglaBook.org

গাঁধী নিজস্ব বিমানে করে গিয়ে পশ্চিমের বড় বড় দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের অবস্থার গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কেউই বিশেষ সাহায্যের আশ্বাস দেননি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তো রীতিমতন অপমানই করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। কিছুতেই কোনও যৌথ বিবৃতি দিতে রাজি হননি।

ইন্দিরা গাঁধী বুঝে গিয়েছিলেন, এ যুদ্ধটা তাঁকে একাই লড়তে হবে। অবশ্য খুব বিপদে পড়লে পাশে থাকবে রাশিয়া। আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে, তাদের সাহায্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক গুজবের পিছনেই উত্তেজনা থাকে, কিন্তু তা যুক্তির ধার ধারে না। তিরিশ-চল্লিশ হাজার চিনা সৈন্য পৌঁছে গেছে ঢাকায়, ওখানকার সেনাপতি নিয়াজিও তাই আশা করেছিলেন। কিন্তু চিন সরকার সৈন্য পাঠাতে রাজি হলেও তারা ঢাকায় পৌঁছোবে কী করে?

যুদ্ধের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বিমানবাহিনী যখন উত্তর ভারতের কয়েকটি শহরে ব্যস্ত, তখন ভারতীয় বিমানবাহিনী এসে হানা দিল ঢাকার বিমানবন্দরে। প্রথম দিন পাকবাহিনী তাদের প্রতি-আক্রমণ করল, ভারতের কয়েকটি বিমান ধ্বংসও হল। কিন্তু পরের দিন সন্ধেবেলা ভারতীয় বাহিনী ফিরে এল দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, প্রবল বোমাবর্ষণে তারা ঢাকার বিমানবন্দর একেবারে অকেজো করে দিল। তছনছ হয়ে গেল রানওয়ে। তেজগাঁও বিমানবন্দরে পাঁচশো কিলোগ্রাম ওজনের ছ'খানা বোমার আঘাতে বিরাট বিরাট গর্ত তৈরি হয়ে গেল। কুর্মিটোলায় যে-নতুন বিমানবন্দরটি তৈরি হচ্ছিল, বোমাবর্ষণে সেটাও আর ব্যবহারযোগ্য রইল না। সেখান থেকে

BanglaBook.org

আর কোনও বিমান উঠতেও পারবে না, নামতেও পারবে না। পাকিস্তানি স্যাবার জেটগুলি সেখানে পড়ে পড়ে মার খেল। তিন দিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ সম্পূর্ণ ভারতীয় বিমানবাহিনীর দখলে।

সুতরাং গুজবের চিনা বাহিনী ঢাকায় এসে পৌঁছোবে কী করে? উপায় তো নেই। এমনকী করাচি থেকে এদিকে কোনও সাহায্য, সৈন্য, গোলা-বারুদও তো আকাশপথে পাঠানোর উপায় রইল না।

পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে 'গাজি' নামে একটি সাবমেরিন অত্যন্ত শক্তিশালী, ওরকম সাবমেরিন ভারতেরও নেই। পূর্ব পাকিস্তানের দিকে গাজি রওনা হয়ে গেছে ভারতের নৌবাহিনী ছিন্নভিন্ন করার জন্য, কিন্তু বিশাখাপত্তনম বন্দরের কাছে ভারতীয় নৌবাহিনীর 'ডেসট্রয়ার আইএনএস রাজপুত' সেই ডুবোজাহাজটির সন্ধান পেয়ে গেল। বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারল না গাজি। পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইল না যে গাজির চির সলিলসমাধি ঘটে গেছে।

তারপর 'আইএনএস ভিক্রান্ত্' তার সি-হক বিমানগুলি নিয়ে পাহারা দিতে লাগল জলপথ। চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের সেনা ছাউনিতে মাঝে মাঝেই হানা দিতে লাগল সি-হক বিমান।

বাকি রইল আমেরিকা। হঠাৎ শোনা গেল, আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর দিয়ে এগিয়ে আসছে পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য। সপ্তম নৌবাহিনী এক বিরাট ব্যাপার, তাকে মোকাবিলা করার মতন ক্ষমতা ভারতের নেই।

আমেরিকার সেভেন্থ ফ্লিট যদি সত্যিই গোলাবর্ষণ শুরু করত, তা হলে বোধহয় তৃতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠত

BanglaBook.org

এখানেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পোল্যান্ডের মতন এই যুদ্ধের প্রথম বলি হত কলকাতা।

কিন্তু পাকিস্তানকে প্রচুর অস্ত্র ও বদান্যতা দেখাবার পরেও আর এত বড় ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেভেন্থ ফ্লিট গুজবের মরীচিকা হয়েই মিলিয়ে গেছে দিগন্তে।

আগের রাতে টাঙ্গাইলের আশেপাশে হাজার হাজার প্যারাট্রুপার্সদের অবতরণ করতে দেখে অবরুদ্ধ পাকিস্তানি সেনাদের খুব আশা হয়েছিল, এই বুঝি চিনা বাহিনী এসে গেল। আকাশ ছেয়ে গেছে হাজার হাজার প্যারাসুটে। খানিক বাদেই জানা গেল, তারা চিনে নয়, ভারতীয় বাহিনী, তারা এসেছে ঢাকা শহর ঘিরে ফেলতে।

তার কিছুক্ষণ পরই ভারতের সমস্ত রেডিয়ো স্টেশন থেকে ঘোষণা হতে লাগল ভারতীয় সেনাপতি মানেক শ'-এর গম্ভীর গলায় আবেদন: পাকিস্তানি সিপাহি, হতিয়ার ডাল দো!

ঢাকা শহর এখন ভারতীয় বাহিনীর কামানের আওতার মধ্যে এসে গেছে, মাথার ওপর ঘুরছে বিমানবহর, এরপর আর যুদ্ধ চালিয়ে গিয়ে লাভ কী? শুধু শুধু আরও হাজার হাজার মানুষের প্রাণ যাবে। আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনও গতি নেই।

এর মধ্যে কিছু কিছু অতি নির্মম, নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘটে গেছে।

মুক্তিবাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পাকবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে। এ দেশের ঝোপ-জঙ্গল, নদী-নালা তাদের কাছে নখদর্পণের মতন, আর তাদের তাড়া করতে গিয়ে পাকবাহিনীর দিশাহারা অবস্থা। কোথাও কোথাও তাদের অবস্থা কাদায় পড়া হাতির মতন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, পাকবাহিনী সরাসরি ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পিছুপা নয়, কিন্তু

BanglaBook.org

মুক্তিবাহিনীকে দেখলেই তারা ভয় পায়। তারা জেনে গেছে, মুক্তিবাহিনীর হাতে পড়লে তাদের আর বিন্দুমাত্র বাঁচার আশা থাকে না।

কিন্তু মুক্তিবাহিনীর আসল শত্রু তো দেশের মধ্যেই।

সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমান ছিয়ানব্বই পারসেন্ট ভোট পেয়েছিলেন, তা বলে কি পূর্ব বাংলার সব মানুষই তাঁর স্বাধীন বাংলার ডাক সমর্থন করেছে? বহু সংখ্যক মানুষই পাকিস্তান ভাঙার বিপক্ষে। পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র, ভারত তার শত্রু, সুতরাং ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার। বাংলা ভাষার দাবি, বাঙালিয়ানা, এসবের চেয়ে ইসলাম অনেক ঊর্ধ্বে।

এরাও অস্ত্র হাতে নিয়েছে আর আল-বদর, শান্তি কমিটি এইসব নাম দিয়ে হাত মিলিয়েছে পাকবাহিনীর সঙ্গে, আর চোরাগোপ্তা আক্রমণে খুন করছে মুক্তিবাহিনীর যুবাদের। পাক কর্তাদের নির্দেশে তারা বেছে বেছে শহরের বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের হত্যালীলায় মেতেছে। সেরকম বিশিষ্ট কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছেছে কবুতরহাটির অদূরে মুক্তিবাহিনীর শিবিরে।

মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রকাশ্যে খুব একটা দেখা দেয় না। তবে রাত্তিরের দিকে কয়েকজন বেরোয় একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে আর সুধাবউদির সঙ্গে দেখা করতে।

বসুধা ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন, রতনের মা এসে খবর দিল যে, তিনটি ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

হাতমুখ ধুয়ে নীচে এসে তিনি দেখলেন, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মনিরুল, স্বপন আর জহির। তিনজনেরই কাঁধে

BanglaBook.org

রাইফেল। ধূসর রঙের প্যান্ট-শার্ট, মাথায় টুপি।

বসুধাকে দেখে পায়ে পা ঠুকে স্যালুট দিল তারা। তারপর হেসে উঠল।

বসুধাকে এরা সুধাবউদি বলে ডাকে, মাঝে মাঝে বলে, জেনারেল।

বসুধা বললেন, কী ব্যাপার, এত রাতে?

মনিরুল বলল, বেড়াইতে বেড়াইতে আইস্যা পড়লাম। আজ শীত বেশি নাই।

জহির বলল, যুদ্ধের গরমে ডিসেম্বরের শীত পলাইয়া গেছে। পরিষ্কার আকাশ, অনেক তারা দেখা যায়।

এদের কোথায় বসতে বলবেন বসুধা? এক তিলও জায়গা নেই। এর মধ্যে একদিন আস্তাবলটা পরিষ্কার করানো হয়েছিল, বসুধার অনুমতি না নিয়েই তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে দুটি পরিবার। এ বাড়ির মালিকপক্ষের বয়স্ক পুরুষরা কেউ নেই, তাই কেউ কাউকে মানতে চায় না।

দু'-চারজন কৌতূহলী উঠে এসে দাঁড়িয়েছে, এদের সামনে তো কিছু কথা বলাও যাবে না। একমাত্র পুকুরঘাটের সিঁড়িতে বসা যেতে পারে। বসুধা ছাড়া এ-ধরনের বাড়ির আর কোনও বউ রাত্তিরবেলা সেখানে গিয়ে বসার কথা চিন্তাও করতে পারত না বোধহয়।

ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বসুধা বললেন, তোমরা এত রাতে আমার কাছে এলে, আমার কাছে তোমাদের কি কিছু দরকার আছে?

জহির বলল, দরকার আছেও বটে, আবার নাইও বটে।

বসুধা বললেন, এ তো হেঁয়ালি।

BanglaBook.org

জহির বলল, হেঁয়ালি না। দরকারের সাথে আছে প্রয়োজনের সম্পর্ক। আবার বিনা প্রয়োজনেও তো মানুষের কাছে মানুষের আসার দরকার হয়।

মনিরুল বলল, যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমাদের এই ক্যাম্প ভেঙে দিতে হবে। তারপর আমরা কে কোথায় থাকব ঠিক তো নাই। দুনিয়াতেও না থাকতে পারি।

বসুধা জিজ্ঞেস করলেন, যুদ্ধ সত্যি শেষ হয়ে আসছে?

মনিরুল বলল, বাতাসে সেরকমই গন্ধ পাচ্ছি। তবে, তার আগে শেষ দু'-তিনদিন খুব ক্রুশিয়াল ব্যাটল হবে। আমাদের সাথেও রাজাকার আর শান্তি কমিটির মেম্বারদের একটা হেস্তনেস্ত লড়াই আছে। হয়তো আজ রাতেই।

তাকে বাধা দিয়ে জহির বলল, আমরা এই গ্রামের তিনজনের সঙ্গে আজ রাতেই দেখাসাক্ষাৎ সেরে নিচ্ছি। যে-তিনজন সর্বক্ষণ আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, ইন্‌সপায়ার করেছেন। জগৎ সেন মাস্টারমশাই, ডাক্তার কুমারশঙ্কর আর আপনি।

পুকুরটা বেশ বড়ই, কিন্তু মজে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ঘাটের সিঁড়ির একপাশে একটা বসার জায়গা, শখ করে বানানো হয়েছিল, এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। ওর মধ্যে সাপখোপ থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। তবে এখন শীতকাল বলেই সাপের আশঙ্কা নেই।

সেখানে বসে পড়ে বসুধা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের তিনজনের কি একই জায়গায় বাড়ি? তোমরা মিললে কী করে?

এই তিনজনের মধ্যে স্বপনই সবচেয়ে কম কথা বলে। জহিরই বাক্যবাগীশ। সে বলল, না, না, আমাদের বাড়ি তিনজনের তিন

BanglaBook.org

জায়গায়। এই স্বপনের বাড়ি ঢাকার কাছেই, মনিরুলের বাড়ি মাদারিপুরের কাছে ট্যাকেরহাট, আর আমার বাড়ি, মৈমনসিং-এর একটা ক্ষুদ্র, অখ্যাত গ্রাম, খয়েরুলভাসা। আমাদের ওই গ্রামে এক ঘরও হিন্দু নাই। শৈশবকালে আমি হিন্দু দেখি নাই। তবে আমার বাপ-দাদারা আফশোস করতেন, যারা চলে গেছে, একজন মাস্টার, একজন পক্ষীশিকারির নামে। সেই পক্ষীশিকারির নাম ছিল সহদেব, তার সম্পর্কে কত গল্প...

তাকে থামিয়ে মনিরুল বলল, আমরা তিনজনই তো ঢাকার ছাত্র। জগন্নাথ হলে একসাথে...

জহির বলল, আমরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর কিছুদিন ঢাকার আশেপাশেই ছিলাম। ওখানকার সেক্টার কমান্ডার খালেদ মুশারফ আমাদের পাঠালেন এই ক্যাম্পে।

বসুধা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়িতে...সবাই আছেন?

জহির বলল, আমার মা-বাবা, তিনটে বোন, সবাই আছে। মনিরুলের বাবা নাই, মা আছেন মামার বাড়ি, আর স্বপন, তোর তো বাবা-মা সবাই আছেন? ও, মা নাই বোধহয়?

স্বপন বলল, আমার সাত বছর বয়সে...

বসুধা বললেন, মাঝে মাঝে কি বাড়িতে যেতে পারো? সবাইকে দেখে আসতে পারো?

জহির বলল, ঢাকার কাছে থাকার সময় যেতে পারতাম। এখন...প্রায় তিন মাস আর যাওয়া সম্ভব হয় নাই। শান্তি কমিটির...ইয়েরা আমাদের নাম লিস্ট করে ফেলেছে তো, গেলেই খপ করে ধরবে। আশা তো করছি, যুদ্ধ এবার শেষ হবে, ইনসাল্লা তখন ওইসব কমিটির লোকগুলোকে...

মনিরুল বলল, সুধাভাবী, আপনার কাছে মাঝে মাঝেই আসি

BanglaBook.org

কেন জানেন? আপনাকে দেখলেই কেমন যেন বাড়ি বাড়ি লাগে। মায়ের কথা মনে পড়ে।

স্বপন আপন মনে বলে উঠল,

আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম-বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন...

জহির তাকে এক চাপড় মেরে বলল, এই হারামজাদা, থাম! এটা অলক্ষুনে কবিতা।

মনিরুল বলল, কর্ণকুন্তী সংবাদ। কেন, দোষটা কী?

জহির বলল, এটা বড় পেসিমিস্টিক...হেরে যাওয়ার কথা। আজ রাত্তিরেই আমাদের একটা বড় অ্যাকশনে যেতে হবে, তখন শুধু বলতে হবে, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, উই শ্যাল ওভারকাম।

বসুধা জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাত্তিরেই অ্যাকশনে যেতে হবে? কোথায়?

জহির তাঁর দিকে ফিরে একটা হাত ধরে বলল, ভাবী, আপনাকে আমরা এত ভালোবাসি, এত শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এই কথাটা আপনাকেও বলতে পারব না। নিয়ম খুব স্ট্রিক্ট! আপনার আঙুলগুলো কী সুন্দর।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বসুধা বললেন, আমার ভয় করে। এইসব অ্যাকশন-ট্যাকশনের কথা শুনলেই আমার ভয় করে।

BanglaBook.org

মনিরুল বলল, খুব ইচ্ছা করে কী জানেন? কবে বাড়ি যাব তার ঠিক নাই। রোজ খিচুড়ি খেতে খেতে মুখ পচে গেছে। একদিন আপনার হাতের রান্না ইচা মাছের ঝোল আর গরম ভাত খাব।

স্বপন বলল, মাছ আমরাই নিয়ে আসব। এই খালে অনেক মাছ পাওয়া যায়।

মনিরুল বলল, সরু সরু বেগুন আর ইচা মাছের পাতলা ঝোল। পাতলা পাতলা আলুও দিতে পারেন, আর কাঁচা মরিচ।

বসুধা বললেন, খাওয়াব, নিশ্চয়ই খাওয়াব। কাল, না, কাল ঠিক হবে না, পরশু রাতে তোমরা তিনজনই এখানে এসে খেয়ো। মাছ আনতে হবে না।

জহির বলল, ধুর, ছাড় তো খালি খাওনের কথা। বউদি, তোমার পাশে এই যে আমরা বসে আছি, স্বপনই তো বলল এখানে আসার কথা, কী যে ভালো লাগছে, মনে হয় যেন অনন্তকালের মধ্যে আমরা কোথাও ভেসে ভেসে, একটা চিহ্ন হয়ে...

মনিরুল বলল, থাক, তোকে আর বেশি কবিত্ব করতে হবে না।

জহির বলল, আমার ওসব আসেও না। তবে ভালোলাগার কথাটা যেন একটা চিরকালের ট্রুথ।

এই সময় কিছু দূরে একটা হুইসলের শব্দ শোনা গেল।

জহির সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের খুঁজছে।

সে-ই একটা হুইসল বাজাল। একটু বাদে অন্ধকার ভেদ করে আর একটি ছেলে এসে দাঁড়াল সেখানে।

সে বসুধাকে আদাব জানিয়ে জহিরকে বলল, অপারেশন রজনীগন্ধা।

BanglaBook.org

মনিরুল বলল, আমরা রেডিই আছি। বউদি, আমরা যাই, আপনি দোয়া করবেন। আবার দেখা হবে।

তিনজনেই বসুধার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে এল। তিনি একজনের হাত ধরে ফেলে আটকালেন, অন্য দু'জনকে বাধা দিতে পারলেন না।

ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার পরও বসুধা কিছুক্ষণ বসে রইলেন সেখানে। আকাশে আজ বেশ জ্যোৎস্না, চতুর্দিক শান্ত, বসুধা মন দিয়ে শুনতে লাগলেন একটা রাতপাখির ডাক।

পাঁচ

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সেনাপতির ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী অস্ত্রত্যাগ এবং আত্মসমর্পণে রাজি হল।

লেফটেনান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি, যিনি একসময় পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে যে-কোনও সময় কলকাতা দখল করে নিতে পারেন। নিচ্ছেন না, কারণ শহরটা খুব নোংরা। যিনি বলেছিলেন, ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে ভারতের মাটিতে, পাকিস্তানের এক ইঞ্চি জমিতেও তিনি ওদের পা দিতে দেবেন না, আজ তিনি একজন অতি বিমর্ষ মানুষ।

সকালবেলাতেই তিনি নাগরা নামে ভারতীয় এক মেজর জেনারেলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। এই নাগরাকে তিনি চেনেন, দেশ যখন ভাগ হয়নি, সেই ব্রিটিশ আমলে

BanglaBook.org

দু'জনে একটি জায়গায় কমিশন্‌ড অফিসার হয়ে সামরিক ট্রেনিং নিয়েছেন।

দূত মারফত প্রেরিত সেই চিঠিটি ব্যক্তিগত, খুবই সংক্ষিপ্ত:

প্রিয় আবদুল্লা,

আমরা এসে পড়েছি। তোমাদের চতুর্দিকে ঘিরে ফেলেছি। তোমার খেলা শেষ। আত্মসমর্পণ অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া, এর মধ্যে বেছে নাও। আমরা কথা দিচ্ছি, তোমাদের সঙ্গে জেনিভা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার জীবনের কোনও ভয় নেই। ইতি—

মেজর জেনারেল নাগরা, সকাল ৮-৩০, ১৬-১২-৭১

নিয়াজি আগেই খবর পেয়েছেন নারায়ণগঞ্জ, দায়ুদকান্দি, নরসিংদি ভারতীয় সেনাদের দখলে। আকাশে ভারতীয় বিমান উড়ছে, পাকিস্তানি বিমানের কোনও চিহ্ন নেই।

নিয়াজি একজন দক্ষ সেনানী, পাকিস্তানি বাহিনীও রণকুশলতার জন্য খ্যাত, তবু এই অপমানজনক পরাজয় মেনে নিতে হল কেন? ফরমান আলি, জামশেদ, শরিফরা নানা কথা বলছে, নিয়াজির কিছুই পছন্দ হচ্ছে না। মাথা ঝাঁকাচ্ছে শুধু। আত্মসমর্পণ অথবা যুদ্ধ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। একদা যে-নাগরার সঙ্গে তিনি বহু ঠাট্টা-ইয়ারকি করেছেন, এখন সে তার জীবনভিক্ষা দিতে চায়।

রমনার রেসকোর্স মাঠ, যেখানে ৭ মার্চ শেখ মুজিবর রহমান প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের ডাক দিয়েছিলেন, সেখানেই বিকেলবেলা হল সংক্ষিপ্ত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে ফরমান আলি চেয়েছিল, দলিল থেকে ভারত-

BanglaBook.org

বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের বদলে শুধু ভারতের নাম লেখা হোক, ভারতের পক্ষ থেকে সে দাবি সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাহ্য করা হল।

একজন সেনাপতির পক্ষে সবচেয়ে অপমানের মুহূর্ত। নিয়াজির মুখখানা এমনই থমথমে যে হঠাৎ যেন ফেটে পড়তে পারে।

অন্যান্য অফিসাররাও তাঁদের রিভলভার নামিয়ে রাখলেন মাটিতে।

অদূরে জয় বাংলা স্লোগানে আকাশ ফেটে যাচ্ছে।

ভারতের পক্ষ থেকে ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অরোরা উপস্থিত হলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে জেনারেল ওসমানিকে আনার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আসেননি। কাদের সিদ্দিকি আরও কয়েকজন পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা রইলেন সেখানে। দলিলে সই করার সময় খুব হাত কাঁপার জন্য অনেকটা সময় নিলেন নিয়াজি, তারপর কোমর থেকে রিভলভার বার করে দিলেন অরোরার হাতে।

যুদ্ধ শেষ। বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের আজই পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান এখন কোথায়? তিনি কি পাকিস্তানের জেলে? নাকি এর মধ্যেই তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে, তা কিছুই জানা যায় না।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেই পঁচিশে মার্চ গুলি চালাবার হুকুম দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি উড়ে চলে গেলেন, এই ন'মাসের মধ্যে তাঁর নিজের দেশের এই অংশে আর একবারও এলেন না। জুলফিকার আলি ভুট্টো, যিনি শেখ মুজিবকে কিছুতেই ক্ষমতায় আসতে দেবেন না বলে জেদ করে রইলেন, তিনিও এর মধ্যে একবারও দেখতে এলেন না যে, পূর্ব অংশে সেনাবাহিনী কীভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে। ওঁরাই তো

BanglaBook.org

দেশটা ভাঙলেন। পূর্বের ভারতবর্ষ এক থেকে দুই হয়েছিল, এবার তিন হল। ভবিষ্যতের গর্ভে আরও কী আছে কে জানে!

পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ উপলক্ষে কয়েকজন সিভিলিয়ান অফিসারকেও পাঠানো হয়েছে দিল্লি থেকে। ঢাকায় সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে। শেখ মুজিব নেই, তাঁর নামের ম্যাজিকে যে কাজ হত, তা হচ্ছে না বলেই কেউ কাউকে মানছে না। মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় রাস্তায় উল্লাস করছে, যখন তখন তারা রাইফেল থেকে গুলি চালাচ্ছে আকাশের দিকে।

তাজুদ্দিন, নজরুল ইসলাম তাঁদের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করবেন, তাঁদের কিছু পরামর্শ দেওয়ার জন্যই এসেছে দশজন অফিসারের একটি দল। তাঁদের মধ্যে আছেন বীরেশ্বর দত্ত।

অন্তত দু'সপ্তাহ এখানে থাকতে হবে, তাই বীরেশ্বর গ্রাম থেকে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের আনিয়ে নিলেন। পূর্বাণী হোটেলের একটি সুইট তাঁর জন্য বরাদ্দ। তাঁকে কাজে যেতে হয় বঙ্গভবনে।

ঢাকায় এসে বসুধার মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। এত কষ্টের পর বাংলাদেশের জন্ম হল, এ তো খুবই আনন্দের কথা। কয়েক মাস শরণার্থী শিবিরগুলো সামলাতে সামলাতে, তিনি ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা ক্লান্ত হয়ে তো পড়েছিলেনই, বাইরে থেকে তা বোঝা না গেলেও। শরণার্থী শিবিরগুলি এর মধ্যেই গুটোতে শুরু করেছে, বসুধা ভেবেছিলেন তিনি ঢাকায় এসে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করবেন।

কিন্তু এখানে খবরের কাগজের পাতায় প্রতিদিন শুধুই মৃত্যু আর ধ্বংসের তালিকা। এত মৃত্যু, তার বিনিময়ে এই স্বাধীনতা।

BanglaBook.org

মেয়েদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ পড়তে পড়তে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। কাগজ ঠেলে সরিয়ে দেন।

খাবার টেবিলে রণ হঠাৎ বলল, বাবা, আমায় একটা এলএমজি কিনে দেবে?

বসুধা আর বীরেশ্বর দু'জনেই চমকে উঠলেন। বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, এলএমজি, মানে লাইট মেশিনগান? তা দিয়ে তুই কী করবি?

রণ বলল, রেখে দেব। আবার যুদ্ধ লাগলে লড়াই করব। আমি জহিরদাদের ক্যাম্প গিয়ে দেখেছি, চালানো খুব শক্ত না। একদিন আমায় হাতে দিয়েছিল।

বীরেশ্বর বললেন, আবার কীসের যুদ্ধ? না, না, ওসব কথা ভাবতে নেই।

রণ তবু উৎসাহের সঙ্গে বলল, এই হোটেলের বেয়ারা আছে কাদের, সে বলছিল, পাকিস্তানিদের ওই সব আর্মস এখন খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে।

বাবা বললেন, সস্তায় বিক্রি হচ্ছে বলে আমাদের কিনতে হবে? ওগুলো কি খেলনা? সাংঘাতিক অস্ত্র।

বসুধা ছেলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আস্তে আস্তে বললেন, রণ, তুই যে বলেছিলি তুই বড় হয়ে ভূপর্যটক হবি, ওয়ার্ল্ড ট্র্যাভেলার।

রণ হাসিমুখে বলল, না, মা। আমি আর্মিতে ভর্তি হব। আই ওয়ান্ট টু বি আ জেনারেল।

জুলি ইদানীং খেতে বসেও বই পড়ে। এখন বই থেকে মুখ তুলে বলল, জেনারেল অরণ্য দত্ত। না, রনি ডাট। কিন্তু তুই পারবি না, তুই বেঁটে!

BanglaBook.org

রণ বলল, বেঁটে মানে? আমি তো এখনও লম্বা হতে শুরুই করিনি।

স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বীরেশ্বর বললেন, দেখো, যুদ্ধের কী কুফল! বাচ্চাদেরও মাথা খেয়েছে।

বসুধা বললেন, রণ, তুই মিলিটারি হয়ে কী করবি? পৃথিবীতে আর তো কোনও যুদ্ধ হবে না।

রণ একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, ওয়ার্ল্ডে আর কখনও যুদ্ধ হবে না? যাঃ!

বসুধা আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, না, আর যুদ্ধ হবে না। মানুষ আর যুদ্ধ করবে না। মানুষ আর মানুষকে মারবে না।

রণ তবু বলল, যদি চাইনিজরা আমাদের অ্যাটাক করে!

বসুধা বললেন, রণ, সোলজার হলে মানুষকে মারতে হয়। তুই মানুষ মারতে চাস? তুই যাকে মারবি, তারও মা-বাবা আছে, ভাই-বোন আছে, তাই না? এই দেখ না, এই যে যুদ্ধ হল, বাংলাদেশ জিতে গেছে, তবু কত বাবা-মা কাঁদছে।

তারপর মুখ ফিরিয়ে তিনি স্বামীকে বললেন, মুক্তিবাহিনীর ক'টা ছেলে আমার কাছে প্রায়ই আসত। ভেবেছিলাম, ঢাকায় তাদের সঙ্গে দেখা হবে। যুদ্ধ থামার দু'দিন আগে ওরা কী একটা অ্যাকশনে চলে গেল। তার পরের দিন আর ওরা ওখানে ফেরেনি। হয়তো ওরা এদিকেই রয়ে গেছে। ওরা বলেছিল, খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে ওদের মুখ পচে গেছে, আমার কাছে একদিন ছোট চিংড়িমাছ আর বেগুনের পাতলা ঝোল দিয়ে সাদা ভাত খেতে চেয়েছিল।

বীরেশ্বর বললেন, আশা করি তারা ঠিকঠাক আছে। দেখা হয়ে

BanglaBook.org

যাবে। শেষ দু'দিনে পাকিস্তান একটা খুব কাওয়ার্ডলি কাজ করেছে। রাজাকারদের সাহায্য নিয়ে বেছে বেছে ইন্টেলেকচুয়ালদের খুন করিয়েছে। ছি, ছি, ছি।

ওদের খাবারের ব্যবস্থা এই সুইটের মধ্যেই। রুম সার্ভিস। কাদের নামের একটি বেশ হাসিখুশি ছেলে সব কিছু এনে দেয়। তার কাছ থেকে নানা উত্তেজক গল্পও শোনা যায়। শুনতে না চাইলেও সে শোনাবেই।

প্রায় প্রতি রাতেই অবশ্য বাইরে খেতে হয়। দাওয়াত। দু'-তিন রাত কয়েক বাড়িতে সেই দাওয়াত খেয়েই বসুধার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। সে কী এলাহি খাওয়ার ব্যবস্থা! কত রকম মাছ, কত রকম মাংস, প্রায় কুড়ি-বাইশ পদ। অত কি কোনও মানুষ খেতে পারে? খাদ্যের বহর দেখলে বোঝার উপায়ই নেই যে, কয়েকদিন আগেও এ দেশে একটা ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে। কোথা থেকে এইসব খাবার আসে? আর এই নিমন্ত্রিত প্রায় পঁচিশ-তিরিশজন মানুষ বেশ হাসিমুখেই যুদ্ধের গল্প করে, তর্ক করে। অর্থাৎ এদের পরিবারে যুদ্ধের আঁচ লাগেনি। আর মেয়েরা কী দুর্দান্তভাবে সাজে। এক-এক জন নারী যেন ডানাকাটা পরি।

বসুধা যদিও বিশেষ সাজপোশাক করেন না, তবু অনেকেই মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। রণ আর জুলিকে দেখে কোনও কোনও মহিলা বলে ওঠেন, আপনার এত বড় ছেলেমেয়ে? বিশ্বাসই হয় না, ভাবী।

একটা পার্টিতে দু'জন যুবককে ঘিরে বসে ছিল অনেকে। এই যুবক দু'জন মুক্তিযোদ্ধা, তাদের মধ্যে হাবিব ধলেশ্বরী নদীতে পাকিস্তানি স্টিমার আক্রমণ ও বহু অস্ত্রশস্ত্র লুটের নায়ক হিসেবে

BanglaBook.org

বিখ্যাত। এখন যুদ্ধ নেই, তবু এই সময় যুদ্ধের রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে ভালো লাগে।

প্রথম কিছুক্ষণ জয়ের কাহিনির পর সহযোদ্ধা ও বন্ধুদের বিচ্ছেদের কথা এসেই পড়ে। বসুধাও শুনছিলেন, একসময় তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ভাই, তোমাদের মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সংখ্যা কত ছিল, তার কোনও হিসেব হয়েছে?

হাবিব বলল, মোটামুটি একটা হিসাব আছে। পাকিস্তান আর্মিতে যত বাঙালি সোলজার ছিল, তার মধ্য থেকে যতজন বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কুড়ি হাজার। আর রীতিমতন ট্রেনিং পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা এক লক্ষ তো হবেই। তার বাইরেও কিছু ছোট ছোট গ্রুপ ছিল।

বসুধা বললেন, আর ক্ষয়ক্ষতি, মানে যারা আর নেই, হারিয়ে গেছে, তাদের কোনও তালিকা হয়েছে?

হাবিব উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা পানীয় নেওয়ার জন্য যেতে যেতে বলল, ইট ইজ টু আর্লি ফর দ্যাট। নানা জায়গা থেকে রিপোর্ট আসতেছে। এখনও কিছু জমা-খরচ বাকি আছে। শেখ সাহেব ফিরে আসার আগে আমরা হাতিয়ার ছাড়ব না।

বসুধাও উঠে পড়ে যেতে যেতে বললেন, আমাদের কবুতরহাটি খালের ওপারেই মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প ছিল। তুমি কি ভাই, বাই এনি চান্স মনিরুল, জহির, আর, আর, ইয়ে স্বপন, এদের চেনো? কিংবা এদের কোনও খবর জানো?

হাবিব বলল, এদের পুরা নাম কী?

বসুধা বললেন, তা তো জানি না। এই নামেই... একজনের হয়তো... না, তাও বোধহয় ঠিক নয়।

হাবিব বললেন, এই তিনটাই আমাদের দেশের খুব কমন

BanglaBook.org

নাম। যেমন আমার নাম যে হাবিব, আপনি রাস্তায় গিয়া এক ঘণ্টা দাঁড়ান, অন্তত তিন গন্ডা হাবিব পাবেন। সেই জন্যই যুদ্ধের সময় আমার নাম ছিল পাইলট। পাইলট হাবিব বললে সক্কলে একডাকে চিনত। কিছুদিন পাইলটের ট্রেনিং নিছিলাম তো। সুতরাং শুধু ওইটুকু নামে এত মানুষের মধ্যে খুঁজে বার করা কি সম্ভব?

থমকে দাঁড়িয়ে সে আবার বলল, তবে স্বপন নামে আমি একজনকে চিনি। সে অন্য স্বপনও হতে পারে, আমি তার খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাব। আপনারা তো পূর্বাণীতে আছেন, দেখি, কালই আমি ওদিকে যেতে পারি।

এইসব ব্যাপারে অনেকেই কথা রাখে না। পরের কয়েক দিনের মধ্যে হাবিবের আর পাত্তাই পাওয়া গেল না।

ঢাকা শহরটা কলকাতার চেয়ে অনেক ছিমছাম আর সুন্দর মনে হয়। মূল শহরের কোথাও তেমন ধ্বংসের চিহ্ন নেই। দোকানপাট খুলে গেছে, মানুষ মেতে উঠেছে প্রাত্যহিক ব্যস্ততায়। বোঝাই যায় না যে কয়েকদিন আগেই এখানে ছিল যুদ্ধের পরিবেশ।

এটাও বোঝা যায় না যে, এখনও এ দেশে রয়েছে আত্মসমর্পণের পর ভারতীয়দের হাতে বন্দি নব্বই হাজার পাক সৈন্য এবং তাদের সেনাপতি। তারা নিরস্ত্র। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, না হলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে-কোনও সময় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ভারতীয় সৈন্যদেরও বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে দেশে।

বীরেশ্বর অফিস চলে গেলে বসুধা তাঁর ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন দুপুরবেলা। বীরেশ্বরের গাড়িটা ফিরে

আসে। ভারতে এখন বিদেশি গাড়ি পাওয়া যায় না, সবই দিশি গাড়ি। আর ঢাকা শহরে কতরকম দেশের গাড়ি দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

গাড়িতে ঘুরলে তো আর শহর দেখা যায় না, বসুধা তাই মাঝে মাঝে গাড়িটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে রণ আর জুলিকে দু'পাশে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। আশ্চর্য ব্যাপার, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরই শীত পড়তে শুরু হয়েছে। দুপুরের রোদে পার্কে বসে থাকে অনেক মানুষ, ফুলও ফুটেছে প্রচুর।

গাড়ির ড্রাইভার জমিরুদ্দিন বলে, সাহেবরে একদিন সকাল সকাল গাড়ি দিতে ক'ন। আপনাগো মৈমনসিং ঘুরাইয়া আনব। মুক্তাগাছার রাজবাড়ি দ্যাখছেন?

বীরেশ্বর তাঁকে বেশি দূর যেতে বারণ করে দিয়েছেন, তাই বসুধা বললেন, আচ্ছা, তা দেখা যাবে। তুমি আমাদের নারায়ণগঞ্জ নিয়ে চলো তো! সেখান থেকে দিনে দিনে ফিরে আসা যাবে।

সে বলল, নারায়ণগঞ্জ কী করতে যাবেন? খুব ঝঞ্ঝাটের জায়গা! বরং কায়ুদকান্দি চলেন, যদি মাছ কিনতে চান, দুই দিন আগেই একটা এগারো সেরের বোয়াল মাছ উঠছিল, বুঝলেন ম্যাডাম, অত বড় মাছ তো কেনার খরিদ্দার নাই, তাই মাছটা লটারি হইল, দুই টাকার টিকিট, শেষ পর্যন্ত এক নৌকার মাঝি পাইয়া গেল সেই মাছ। ভাবেন তো, কী দুঃখের কথা! অত বড় বোয়াল, মাছের রাজা, বিক্রি হইয়া গেল মাত্তর দুই টাকায়!

বসুধা এই দুঃখজনক গল্প শুনেও বললেন, কিন্তু আমরা তো থাকি হোটেলে, সেখানকার খাবার খাই। আমরা মাছ কিনে কী করব। তুমি নারায়ণগঞ্জে চলো। সেখানে শীতলাক্ষা নদীর ধারে একটু ঘুরে আসব।

BanglaBook.org

জুলি জিজ্ঞেস করল, নারানগঞ্জে কে থাকে?

বসুধা বললেন, আমার চেনা কেউ থাকে না। এমনি জায়গাটার নাম শুনেছি, চল একটু দেখে আসি।

রণ বলল, মা, আমরা একবার বিক্রমপুর যেতে পারি না?

বসুধা বললেন, বিক্রমপুর? তুই নাম জানলি কী করে? সেখানে কী দেখতে চাস?

রণ বলল, রওনক, রওনক আলি, আমরা বলতাম রঙ্কালি। সে বলেছিল, বিক্রমপুরের মালনগরে তাদের বাড়ি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে ফিরে এসেছে। আমাকে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিল।

শরণার্থী শিবিরের কিছু কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলতে যেত রণ আর জুলি। বসুধা তাতে আপত্তি করেননি, শুধু বলেছিলেন তাদের বাড়িতে এনে হইচই না করতে। তাতে বড়পিসিমার অসুবিধে হবে।

রওনক বেশ লম্বা-চওড়া ছেলে, রণের চেয়েও বয়সে বড়, ফুটবল খেলার টিম করেছিল।

জমিরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করা হল, বিক্রমপুর কত দূরে।

সে বলল, মালনগর নাই, মালখানগর আছে। বেশ দূর, তা, সোজা গাড়িতে যাওয়া যাবে না, ফেরি পার হতে হবে।

বসুধা বললেন, ঠিক আছে, রনি, একদিন বাবাকে বলে সবাই মিলে যাব। আজ বরং কাছাকাছি...

নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব বেশি নয়, মাত্র দশ-এগারো মাইল, কিন্তু পথে খুব গাড়িঘোড়ার ভিড়। প্রচুর মানুষ আসছে ঢাকা শহরে। তাদের মধ্যে বিদেশিও আছে। চিনেরা সৈন্য পাঠায়নি, কিন্তু এখন পাঠিয়েছে বড় একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল।

BanglaBook.org

শুধু শুধু জ্যামের মধ্যে বসে থাকা ছেলেমেয়েদের পছন্দ হচ্ছে না। রণ বলল, মা, হোটেলে ফিরে চলো!

বসুধা বললেন, হ্যাঁ, যাব। এসেছি যখন, একবার নদীর ধারটা দেখে যাই!

নদী এখানে বেশ চওড়া। মাছধরা নৌকোগুলোতে নানা রঙের পাল তোলা। হঠাৎ মনে হয়, জলের ওপর বড় বড় প্রজাপতি উড়ছে। ঝকঝক করছে রোদ্দুর।

কে যেন পেছন থেকে ডাকল, বউদি!

বসুধা এমনই চমকে উঠলেন যে তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল। মুখ ফিরিয়ে তিনি হতাশ হলেন।

ধুতির ওপর নীল শার্ট পরা একজন মাঝবয়সি লোক, মুখখানিতে বুদ্ধির দ্রুততার ছাপ আছে। সে একগাল হেসে বললেন, আমায় চিনতে পারলেন না বউদি? আমি গোবিন্দ, গোবিন্দ সাহা।

বসুধা চিনতে পারলেন। এই লোকটি কিছুদিন ত্রাণশিবিরে খিচুড়ি রান্নার কাজ করেছিল। হঠাৎই একদিন কাজ ছেড়ে চলে যায়। এর নামে চুরিটুরির কোনও অভিযোগ ছিল না। হয়তো প্রতিদিন একঘেয়ে কাজ ভালো লাগছিল না তার। এই ধরনের লোক একটা চাকরি ছাড়ার সময় আর একটা কাজ পাবে কি না, সে চিন্তা করে না। ঠিক কিছু একটা জুটিয়েও নেয়।

বসুধা বললেন, হ্যাঁ চিনব না কেন? তুমি এখানে...

গোবিন্দ বলল, এই তো কাছেই একটা গ্রামে আমার বাড়ি। আমরা বাড়ির লোক সব পালিয়ে গিয়েছিলাম ইন্ডিয়ায়, শুধু আমার বাবা যায়নি। ভিটেমাটির মায়া, আর ঠাকুরঘর, আমরা

BanglaBook.org

অনেক করে বলেছিলাম, তবু গেল না। রাজাকাররা শেষ করে দিয়ে গিয়েছে, ঠাকুরঘরও নাই।

বাবার মৃত্যুর জন্য তাকে খুব একটা শোকসন্তপ্ত মনে হল না। যেন এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

সে আবার বলল, বাড়িতেও আগুন লাগিয়েছিল, তয় সবটা পোড়ে নাই। মেরামত করে থাকা যাবে। বউদি, একবার যাবেন নাকি আমাদের বাড়ি, সঙ্গে গাড়ি আছে, বেশিক্ষণ লাগবে না।

বসুধা বললেন, আজ না, ছেলেমেয়েরা ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে।

গোবিন্দ বলল, দূর থেকে রণবাবুকে দেখেই তো চিনলাম।

রণ আর জুলি এর মধ্যেই গাড়ির দিকে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছে। বসুধা থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা গোবিন্দ, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মনিরুল, জহির আর স্বপন, এরা তিন বন্ধু ছিল। এদের কোনও খবর জানো? ওদের একজনের বাড়ি এদিকেই কোথাও ছিল বোধহয়। ওদের কথা মনে আছে?

গোবিন্দ বলল, হ্যাঁ, তখন দেখেছি কয়েকবার। তারপর আমি ঘুরতে ঘুরতে ত্রিপুরায় চলে গেলাম। সেখানেও অনেক রিফিউজি ক্যাম্প ছিল। আমি ফিরেছি মোটে দুই দিন আগে। মুক্তিযোদ্ধাদের খবর কিছু জানি না। কতজন শহিদ হয়েছে আর কতজন... বউদি, সাবধানে চলাফেরা করবেন, এখনও সব কিছু সুস্থির হয় নাই, কবে হবে তাও জানি না!

হোটেলে ফিরে গাড়ি ছেড়ে দিলেন বসুধা।

নিজেদের সুইটে এসে তিনি স্নান করতে ঢুকে গেলেন।

অন্যান্য নারীদের মতন সকালে বা দুপুরে নির্দিষ্ট সময়ে

BanglaBook.org

প্রত্যেকদিন স্নান সেরে নেওয়ার রুটিন নেই বসুধার। দিনের মধ্যে যে-কোনও সময় তাঁর ইচ্ছে জাগে। আবার মন খারাপ হলেও বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান বাথরুমে।

বেরিয়ে এসে বিকেলের চায়ের জন্য অর্ডার দিতে যাবেন, হঠাৎ খেয়াল করলেন, জুলির তো কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। রণ কয়েকটা পুরনো খবরের কাগজ থেকে কাঁচি দিয়ে কী সব খবর বা ছবি কাটছে।

বসুধা জিজ্ঞেস করলেন, বোনটি কোথায় রে রণ?

সে মুখ না ফিরিয়েই বলল, জানি না তো!

বসুধা বললেন, জানি না মানে কী? তোরা দু'জনেই তো লিফটের কাছে এসে বললি, একটু পরে আসবি।

রণ বলল, আমি একটু পরেই তো এসেছি। বোনটি আসেনি। সেটা কি আমার দোষ?

দোষের কথা হচ্ছে না। সে গেল কোথায়? দোকান-টোকানে যায়নি তো?

মা, একগাদা জাপানি ট্যুরিস্ট এসেছে। তোমার মেয়েকেও তো অনেকটা জাপানি জাপানি দেখতে। হতে পারে, ওদের মধ্যে মিশে গেছে।

বাজে কথা বলিস না। এক্ষুনি নীচে গিয়ে বোনটিকে ডেকে নিয়ে আয়।

একটু পরে যাচ্ছি।

একটু পরে না, বললাম যে... আচ্ছা থাক, তোকে যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

সাধারণত চুল ভিজে থাকলে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বেরুতে চান না বসুধা। আগেকার বঙ্গের বধূদের মতন পিঠ

BanglaBook.org

ছাড়ানো চুল রাখেননি বসুধা, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, তবু ঘন, গুচ্ছ গুচ্ছ ঈষৎ কোঁকড়া চুল তাঁর, সহজে শুকোতে চায় না।

মাথায় বাঁধা তোয়ালেটা খুলে ফেলে, পায়ে চটি গলিয়ে তিনি চলে এলেন লিফ্‌টের কাছে।

হোটেলের লবিতে, ডাইনিংরুমে, কয়েকটি দোকানে দু'-তিনবার উঁকি দিয়ে দেখলেন তিনি, জুলি কোথাও নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে তাকালেন চতুর্দিকে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে একবার এ-দোকান, আর একবার ও-দোকানে খুঁজতে লাগলেন। ব্যাকুলতা একটা চরম সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে।

শহরের রাস্তায় কখনও সখনও দেখা যায়, একটা একলা মোষ ডাকতে ডাকতে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হতে পারে, সে যেন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে শহরের ভিড়ে নিজের সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বসুধার অবস্থাও প্রায় সেরকম।

একটু বাদে একটা তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। বুঝলেন, এখানে কাছাকাছি কোথাও নেই জুলি, তিনি ছুটে ছুটে কীভাবে তাকে খুঁজবেন? একটুখানি মাথা ঠান্ডা করে হোটেলে ফিরে এসে লবি থেকেই ফোন করলেন বীরেশ্বরকে।

স্বামীকে ধরা সহজ নয়। কোনও নির্দিষ্ট ফোনের সামনে বসেন না, একজন ফোন ধরে আর একজনকে ডাকে, আর একজন বললেন, মি. দত্ত কোথায় গেলেন দেখছি... না তো, ধরেন, ধরে থাকেন। একটু পরে একজন বলল, মি. দত্ত এখন কনফারেন্সে আছেন, কথা বলা যাবে না।

বসুধাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই লাইন কেটে দেয় অন্য পক্ষ। আমাদের মতন দেশে এটাই প্রথা।

বারতিনেক চেষ্টার পর বসুধা মেজাজ হারিয়ে চিৎকার করে

BanglaBook.org

বললেন, আপনি যে-ই হোন, মি. বীরেশ্বর দত্তকে বলুন, যত কাজই থাক, যত কনফারেন্সই হোক, এক্ষুনি এসে ফোন ধরতে, আমি তাঁর স্ত্রী, খুবই জরুরি দরকার, এক মিনিটও সময় নষ্ট করা চলবে না।

এবার বীরেশ্বর এসে ফোন ধরতেই বসুধা ঢোঁক গিলে নিজেকে একটু শান্ত করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, জুলিকে খুঁজে পাচ্ছি না, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। তুমি... আমি এখন কী করব জানি না, তুমি, তুমি চলে আসতে পারবে? এক্ষুনি, আমাদের জুলি...

বসুধা ফোন করলেন লবি থেকে, তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে অনেকেই। হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারের কর্মীরা এই ক'দিনে চিনে গেছে ওঁদের। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল, হ্যাঁ ঘণ্টাখানেক আগে দেখা গিয়েছিল মেয়েটিকে।

শীতকালের বেলা। বিকেল অনেকটা খেয়ে নিয়ে হঠাৎ ঝুপ করে সন্ধে নেমে আসে। পুলিশে খবর দেওয়া হল, বীরেশ্বরও এসে পড়লেন কিছুক্ষণের মধ্যে।

বসুধাকে এমনিতে মনে হয় শক্ত মনের মানুষ, কিন্তু ছেলেমেয়ের ব্যাপারে খুবই দুর্বল। নিজের ঘরে গিয়ে এমন কাঁদতে শুরু করলেন, তাঁকে থামানোর সাধ্য কারওর নেই।

মেয়েটাকে কেউ ধরে নিয়ে গেল? লবির লোকজনদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অথচ একটা দশ বছরের মেয়েকে কেউ কেন ধরে নিয়ে যাবে, তারও কোনও যুক্তি নেই।

জুলি ফিরে এল ঘণ্টা দু'-এক পরে। একা নয়, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল বীথি ও গাজি সাহাবুদ্দিন নামে এক তরুণ দম্পতি।

BanglaBook.org

তাঁরা ঢাকা ক্লাব থেকে বেরিয়ে এই মেয়েটিকে একা একা হাঁটতে দেখেছিলেন। ওখানকার রাস্তাটা বেশ নির্জন। ঢাকায় এখনও সন্ধের পর মেয়েরা রাস্তায় বেরোয় না, অল্পবয়সি একা একটি মেয়েকে দেখে ওঁদের সন্দেহ হয়েছিল। আশঙ্কা হয়েছিল।

রাস্তা হারিয়েও জুলি কিন্তু খুব ঘাবড়ে যায়নি। কয়েকটা দোকানপাট দেখতে দেখতে, সাহস করে কিছুটা এগিয়ে যেতেই তার দিকভ্রম হয়। কোনদিকে যে পূর্বাণী হোটেল তা খুঁজতে খুঁজতেই সে আরও দূরে চলে যায়। পথের কাউকে জিজ্ঞেস না করে সে নিজেই ঠিক পারবে ভেবেছিল।

সাহাবুদ্দিনের গাড়িতে সে প্রথমে কিছুতেই উঠতে চায়নি। সেটা অবশ্য ঠিকই, তাকে বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল যে সে যেন কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে না যায়, গাড়িতে না ওঠে। জুলিকে রাজি করাতে প্রায় ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিল সাহাবুদ্দিনদের। আরও কয়েকটা গাড়ি থেমে গিয়েছিল, সেইসব গাড়ি থেকে নেমে লোকেরা জুলিকে বুঝিয়েছিল যে ওদের গাড়িতে গেলে ভয়ের কিছু নেই, ওরা ঠিক হোটেলে পৌঁছে দেবে।

জুলির কোনও বিপদ হয়নি, কিন্তু অন্ধকার রাস্তায় আর কিছুক্ষণ থাকলে অবশ্যই বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

এই সুশ্রী ও অতিশয় ভদ্র দম্পতিটিকে বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে বীরেশ্বর ওঁদের রাত্তিরে খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন।

ওঁরা রাজি হলেন না, অন্য জায়গায় যেতে হবে। বরং মহিলাটিই বললেন, আপনারাই কালকে আমাদের বাড়িতে আসেন। রোজ রোজ হোটেলের খাবার কি মানুষের ভালো লাগে?

ছেলেমেয়েদের বকাবকি করার কালচার এ পরিবারে নেই। সাহাবুদ্দিনরা চলে যাবার পর বীরেশ্বর শান্তভাবে বললেন, জুলি

BanglaBook.org

কেন একা একা অত দূর রাস্তায় চলে গিয়েছিল, তা আমরা ওকে এখন জিজ্ঞেস করব না। রণ, তুমি তোমার বোনের কাছ্ থেকে জেনে নিয়ো। জুলি, যাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও। তোমার মা বড্ড কেঁদেছেন!

বসুধা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, না, না, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।

বীরেশ্বর আবার বললেন, দিনের পর দিন এই হোটেলের বন্ধ ঘরে আটকে থাকা, ছেলেমেয়েদের ভালো লাগবে কেন? আমার আরও দিন দশেক কাজ আছে, ভাবছি কাল-পরশুই তোমাদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

বসুধা বললেন, সেটাই ভালো। ওদেরও তো পরীক্ষা এসে গেল। এখানে ঠিক পড়াশুনো হয় না।

সেদিনও দাওয়াত আছে এক পরিবারে। কারওরই আর সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই। বীরেশ্বর ফোনে ক্ষমা-টমা চেয়ে অপারগতা জানিয়ে দিলেন।

নিজেরা খাবার টেবিলে বসার পর জুলির হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা একেবারে উল্লেখ না করে বীরেশ্বর হালকা মেজাজে বললেন, আজ অফিসে এখানকার কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে আমার খুব তর্ক হয়েছে। কী নিয়ে জানো? বাংলাদেশের জন্ম হল। এখন এখানকার মানুষ কী হবে, বাঙালি না বাংলাদেশি? এরা জোর দিয়ে বলছে, এরাই আসল বাঙালি, পশ্চিমবাংলার মানুষ কেউ বাঙালি না, তারা তো ইন্ডিয়ান।

রণ উত্তেজিতভাবে বলল, আমরা বাঙালি না? নিশ্চয়ই বাঙালি।

বীরেশ্বর বললেন, সেটাই আমি এদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

আমরা ইন্ডিয়ান হলেও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষা আলাদা, আইডেন্টিটিও আলাদা। আমাদের কনস্টিটিউশনে বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, তামিল এইরকম চোদ্দোটা ল্যাঙ্গোয়েজকে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ বলে রেকগনাইজ করা হয়েছে। ওরা হাসে। বলে, এতগুলো আবার জাতীয় ভাষা হয় নাকি? আসল জাতীয় ভাষা কোনটা?

রণ বলল, হিন্দি?

এবার জুলি মুখ তুলে বলল, মোটেও না। আমরা বাঙালি। নিশ্চয়ই বাঙালি!

বীরেশ্বর বললেন, এরা আরও একটা কথা বলল। আপনারা যখন বিদেশে যান, তখন কি আপনারা বাঙালি না ইন্ডিয়ান? আপনাদের পাসপোর্টে কি বাঙালি লেখা থাকে? আমাদের পাসপোর্টেও আমরা বাঙালি।

রণ বলল, নীচে রিসেপশনের লোকেরা আমাকে বলে তোমরা ইন্ডিয়া থেকে এসেছ? যত বলি, কলকাতা থেকে, তা মানতে চায় না।

বীরেশ্বর বললেন, আমি ওদের বোঝাতে চাইলাম, ইন্ডিয়া নামের দেশটার এইটাই তো বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এরকম নেই। এখানে অনেক রকম ভাষা, অনেক রকম কালচার, তবু আমরা এক দেশের মানুষ, তবু আমরা ইন্ডিয়ান, এক ন্যাশনালিটি। তা এরা বোঝে না, হাসে।

রণ বলল, বাবা, আগে তো একটাই বাংলাদেশ ছিল। তারপর ভাগ হয়ে গেল। তারপর ওরা পুরো বাংলাদেশ নামটা নিয়ে নিল কেন?

বীরেশ্বর বললেন, ঠিক বলেছিস। আমিও সেই কথাটা ওদের

BanglaBook.org

বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। আগে ওরা বলত জয় বাংলা। সেই স্লোগান দিয়েই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অনেকেই এই দেশটার নামও বলত, জয় বাংলা। তারপর কী করে যেন বাংলাদেশ হয়ে গেল। আমি বললাম, তোমরা আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করলে না, কিছু না। পশ্চিম বাংলার কথা ভুলে গেলে?

বসুধা বললেন, এখন বদলানো যায় না? বাংলাদেশের বদলে জয় বাংলা, শুনতেও বেশ। তা হলে বাংলাদেশ নামটা থাকবে সবার জন্য।

বীরেশ্বর আপশোসের সুরে বললেন, আর কি বদলানো যাবে? যা ইউফোরিয়া চলছে, যেরকম মাতামাতি, এখন ওসব কথা উচ্চারণই করা যাবে না। তবে বদরুদ্দোজা একটা দারুণ কথা বলে আমাকে জব্দ করে দিয়েছে। ও বলল, দেশ যখন ভাগ হয়, সেই উনিশশো সাতচল্লিশ সালে আমরা তো বাঙালি ছিলাম না। আমরা ছিলাম পাকিস্তানি, বা পূর্ব পাকিস্তানি। আমাদের বাঙালি হতে সময় লেগেছে। সেই সময় আপনারা আপনাদের রাজ্যটার নাম পশ্চিম বাংলা রাখলেন কেন? তখন তো আর কাগজে-কলমে পূর্ব বাংলা বলে কিছু ছিল না। আপনারা যদি রাজ্যটার নাম পশ্চিম বাংলার বদলে বাংলাদেশ রাখতেন, কেউ আপত্তি করত না।

বসুধা বললেন, ঠিকই তো বলেছে। পঞ্জাবও ভাগ হয়েছে, সেখানে পূর্ব পঞ্জাব-পশ্চিম পঞ্জাব বলে তো কিছু নেই।

বীরেশ্বর বললেন, ঠিকই তো। তখন আমাদের নেতারা এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি, বোধহয় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতেই ব্যস্ত ছিলেন।

রণ বলল, তা হলে কী ঠিক হল? ওরা বাঙালি।

BanglaBook.org

জুলি বলল, আমরা পশ্চিমবঙ্গ বাঙালি কিংবা ইন্ডিয়ান বাঙালি।

বীরেশ্বর বললেন, আমি কিন্তু বাপু নিজেকে শুধু বাঙালিই বলব। দিল্লিতে গেলে তো সবাই আমাকে বেঙ্গলিই বলে।

বসুধা স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে বাংলাদেশের জন্ম হল, তাতে এদের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিও তো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে, আমাদের ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর, এর পরে, মানে, আমি বলছি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক থাকবে তো?

বীরেশ্বর বললেন, কিচ্ছু বলা যায় না ভবিষ্যতের কথা, তবে এখানকার ভাষাতেই বলি, ইনসাল্লা, তাই যেন থাকে। ভালো সম্পর্কই যেন থাকে!

প্রায় তক্ষুনি দরজায় বেল বাজল।

রণ গিয়ে খুলে দিতেই দু'জন পুলিশ অফিসার ব্যস্ত হয়ে ঢুকে এসে বীরেশ্বরকে বলল, স্যার, আপনার এক মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল?

বীরেশ্বর বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু—

তাঁকে আর কিছু বলতে না দিয়ে পুলিশদের একজন বলল, আমরা মোস্ট প্রোবাবলি তাকে খুঁজে পেয়েছি। বায়তুল মোকারমের কাছে একটা দোকানের সিঁড়িতে বসে কাঁদছিল। এখনও কাঁদছে, গাড়ি থেকে নামতেই চাইছে না। আপনারা গিয়ে যদি আইডেন্টিফাই করেন।

বীরেশ্বর আর বসুধা হাসতে গিয়েও সামলে নিলেন।

বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে বললেন, জুলি, তুমি নীচে যাও, দেখো,

BanglaBook.org

নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারো কি না। রণ, তুমিও বোনের সঙ্গে যাও।

পুলিশ দু'জন এবার জুলিকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

বসুধা ছেলেমেয়েদের বললেন, যা না, নীচে গিয়ে দেখ। ওর যদি খুব খিদে পেয়ে থাকে, এখানে খেয়ে নিতে পারে। রাত্তিরে আমাদের এখানে থেকে যেতেও পারে।

ছয়

জুলির কথা

বাংলাদেশের জন্ম কিংবা যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। তবু সেই বছরটা, উনিশশো একাত্তর সাল, আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল।

আমার মা কিংবা বাবা, কারওরই পরিবারের দিক থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ নেই কিছু। এমনিতে তো সারাক্ষণ শুনি, তখন তো বটেই, এখনও, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কারওর না কারওর পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের কোনও না কোনও জায়গায়। তাই নিয়ে কত আবেগ, কত নস্টালজিয়া। কেউ কেউ তো সেসব জায়গা চোখেও দেখেনি, জন্মেছে এখানে, তবু বলে, আমাদের বাড়ি ছিল টাঙ্গাইল, আমার বাড়ি ছিল মাদারিপুর। অনেক গল্প-উপন্যাসেও এই আবেগের ছড়াছড়ি।

তবে, আমার বন্ধু পিউ-এর মা সুস্মিতামাসির একটা কথা আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। কীরকম অদ্ভুতভাবে হেসে

BanglaBook.org

সুস্মিতামাসি একদিন মাকে বলছিলেন, আমরা কিন্তু সত্যিই জমিদার ছিলাম, রাজশাহিতে আমাদের বাড়িটাকে লোকে বলত রাজবাড়ি। কিন্তু সে কথা আমরা ভুলেও উচ্চারণ করি না। কেন জানিস তো? এখানকার লোকে একসময় বলত, পূর্ববঙ্গ থেকে যত বাঙাল এসেছে, সবাই নাকি জমিদার। একেবারে জমিদারের ছড়াছড়ি!

আমার মামাবাড়ি বীরভূমের আদিত্যপুরে। লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নাকি কীরকম আত্মীয়তা আছে। অর্থাৎ, খাস ঘটি যাকে বলে। আর আমাদের নিজেদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ। অবশ্য অনেকে বলে, দেশ ভাগের সময় মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল মুসলমানপ্রধান আর যশোর জেলাটি ছিল হিন্দুপ্রধান। লজিক্যালি মুর্শিদাবাদের যাওয়া উচিত ছিল পাকিস্তানে আর যশোরের আসা উচিত ছিল ইন্ডিয়ায়। কেন তা হয়নি, তা নিয়ে অনেক থিয়োরি আছে, সেসব কচকচির মধ্যে আমি আর যেতে চাই না।

মোট কথা, বাবা কিংবা মা, কোনও দিক থেকেই আমরা বাঙাল নই, পূর্ব বাংলা কিংবা বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের আলাদা কোনও বুক মোচড়ানি নেই।

আমার বাবার যেহেতু স্থান পরিবর্তনের চাকরি, দাদা আর আমি পড়তাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। তাই দু'বছরের জন্য দিল্লিতে গিয়ে থাকার সময়ও আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি।

আমরা দেশের বাড়িতেও খুব বেশি যেতাম না। দাদা আর আমি দু'জনেই জন্মেছি কলকাতায়। সেবারে পুজোর পর কী কারণে যেন যাওয়া হল, ঠিক মনে নেই, বাবা মাত্র দু'দিন থেকেই চলে এসেছিলেন। ওখানে অত রিফিউজি ক্যাম্প, মা জড়িয়ে গেলেন রিলিফের কাজে। আমি আর দাদা ফিরে এসে মাসির বাড়িতে

BanglaBook.org

থাকলেও কবুতরহাটি আবার ফিরে গেলাম পয়লা ডিসেম্বর। তারপর তো পুরো ডিসেম্বর মাসটাই স্কুলে যাওয়া হয়নি।

ওই স্কুলে পরীক্ষা হত মার্চ মাসে। জানুয়ারি থেকে আবার টেনে পড়াশুনো করলে আমাদের ভালো রেজাল্ট করার কোনও সমস্যাই ছিল না। কিন্তু স্কুলের প্রিন্সিপাল মি. রঙ্গস্বামী আমাদের কিছুতেই পরীক্ষায় বসতে দিতে রাজি হলেন না। সে কী সাংঘাতিক কথা, বাবা ছুটে এলেন দিল্লি থেকে, পশ্চিম বাংলার শিক্ষামন্ত্রীকে ধরা হল, কিন্তু রঙ্গস্বামী অনড়। তাঁর এক কথা, হয় আর এক বছর থাকো, নয় ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাও!

সেই বয়েসে একটা বছর নষ্ট হওয়া মানে দারুণ দুঃখের ব্যাপার। বন্ধুরা সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে যাবে, আর আমরা নীচে পড়ে থাকব? দাদা নিজের আবেগ সব সময় চেপে রাখে, অন্যদের সামনে কখনও কান্নাকাটি করে না, সেই দাদাও রাত্তিরে বিছানায় মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। দাদার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল নীলাঞ্জন, সে বলেছিল, অরণ্য যদি পরীক্ষা না দেয়, তা হলে সেও দেবে না। একেই বলে বন্ধুত্ব! নীলাঞ্জনের বাবা-মা অবশ্য খুব জোরাজুরি করে, এমনকী দাদার সঙ্গেও দেখা করে শেষপর্যন্ত নীলাঞ্জনকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। এবং সে যথারীতি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছিল আর বলেছিল, অরণ্য পরীক্ষা দিলে আমি সেকেন্ড হতাম!

অনেক বছর বাদে, দাদা একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিল, ওই সময় সে আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিল।

এখনও আমাদের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের প্রসঙ্গ উঠলেই আমরা বলি, সেই যে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান, বাংলাদেশের যুদ্ধ হল, তখন আমাদের একটা বছর নষ্ট হয়।

BanglaBook.org

বাংলাদেশের যুদ্ধ আমাদের বড় দুঃখ দিয়েছে।

এর মধ্যে মজার কথা এই, আমাদের পরীক্ষা দিতে দিলেন না যে রঙ্গস্বামী, তিনি তার দু'মাসের মধ্যেই টার্কিতে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন।

বাংলাদেশের ব্যাপারটা থিতিয়ে যাওয়ার পরেই ভারত সরকার বাবাকে পাঠিয়ে দিলেন নাইজিরিয়ার দূতাবাসে। ফার্স্ট সেক্রেটারি। এটা কি প্রমোশন, না শাস্তি? বাবার প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধীর কিছুটা নেকনজর ছিল, সেটা তাঁর কিছু কিছু সহকর্মীর বুক-জ্বালার কারণ হয়েছিল বোধহয়। ভেতরে ভেতরে কলকাঠি নেড়ে বীরেশ্বর দত্তকে ক্ষমতার কলকাঠি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

আমরা রয়ে গেলাম কলকাতায়। যাতে আমাদের পড়াশুনোর আর কোনও ক্ষতি না হয়। দাদা চলে গেল হস্টেলে, আমি বেলামাসির বাড়িতে।

বেলামাসিদের বাড়ি উত্তর কলকাতায়, হরি ঘোষ স্ট্রিটে। তখনও পর্যন্ত যৌথ পরিবার, সেই তিনতলা বাড়িতে মোট উনিশখানা ঘর। ওই সময় আমরা হরি ঘোষের গোয়াল নামে একটা বাড়ির কথা শুনেছিলাম, যেখানে নাকি সারাদিনই রান্না বন্ধ হত না, যত লোকের ইচ্ছে এসে খেয়ে যেত। থেকেও যেত অনেকে। সেই হরি ঘোষের নামেই নিশ্চয়ই এই রাস্তার নাম, কিন্তু তাঁর বাড়িটা দেখিনি।

আমার মেসো বিনয়মোহন রায়ের বাড়ি অবশ্য ঠিক সেরকম নয়, তবে কত লোক যে থাকত, সকলকে চিনতাম না। বাড়িটার ব্যবস্থা ছিল বেশ ভালো, নন্দরাম হাটি নামে একজন ম্যানেজার ছিলেন, কোনও কিছু অসুবিধে হলে তাঁকে জানালেই সুরাহা হয়ে

BanglaBook.org

যেত। পড়াশুনোর ব্যাপারে বিনয়মেসোর নজর ছিল তীক্ষ্ণ।

ছোটবেলা থেকেই অত বড় বড় বাড়িতে থাকার জন্য, পরে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে উঠতে আমার প্রথম দিকে বেশ অসুবিধে হয়েছিল। আবার ভালোও লেগেছিল!

তেরো বছর বয়েস থেকেই আমি সব কিছু জেনে যাই। নারী আর পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে যে একটা কুয়াশার ভাব ছিল, তা একেবারে কেটে যায়। এই বাড়িতে নানা বয়েসের অনেক মেয়ে ও মহিলা, তাদের কথা শুনে শুনেই সব কিছু যেন শিখে গেলাম আপনা আপনি!

আমার আর এক মাসি, টুলুমাসির মেয়ে পিঙ্কিদিদির বিয়ে হল এ বাড়িতেই। তখন তো মাসের পর মাস এই নিয়েই আলোচনা চলেছিল, তারই মধ্যে আমি ঠিকঠাক জেনে গেলাম, কেন বিয়ে হওয়ার পরেই মেয়েদের সন্তান হয়। কুমারীদের তো হয় না। মেয়েদের আর পুরুষদের শরীরের গড়নও আলাদা।

টুকুন, রুপালি, বন্যা, ছটফটি এইসব নামের আমার বিভিন্ন বয়েসি মাসতুতো বোন মাঝে মাঝে আড্ডা দিত আমাদের ঘরে। সবাই আমার চেয়ে বড়। মাঝে মাঝে তারা যখন ফিসফিস করে কথা বলত আর গুবগুব করে হাসত, তখনই বুঝতে পারতাম, ওরা অসভ্য কথা বলছে। কে কাকে চুমো খেয়েছে, কে কার সঙ্গে বেড়াতে গেছে, আর কোন বদমাশ শরীরে বিশেষ একটা অঙ্গে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে, এইসব কথা। তাই শুনে শুনে আমার এই ধারণা হয়েছিল, বিয়ের আগে একটু-আধটু প্রেম করা, কয়েকবার চুমু আর জড়াজড়ি চলতে পারে, কিন্তু বিয়ের পর যা-কিছু শুধু স্বামীর সঙ্গে। বিয়ে মানেই তো একটা পবিত্র সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের মধ্যে থেকেও কোনও বিবাহিত মহিলা

BanglaBook.org

যদি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে, সেটা গভীর অন্যায়। সেটা পাপ।

ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সত্যি-মিথ্যে, ভগবানে বিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের ছেলেবেলা থেকে যেসব ধারণা তৈরি করিয়ে দেওয়া হয় মনের মধ্যে, তা তো অনেক দিন থাকে। এসব নিয়ে প্রশ্ন জাগতে সময় লাগে।

তা হলে আমার মা? আমি তো সত্যি সত্যি নিজের চোখে দেখেছি। আমার মাকে সবাই এত ভালো ভালো বলে, সাধু বাংলায় যাকে বলে মহীয়সী রমণী, তিনি আসলে কুলটা। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করেন, শেষ রাত্তিরে, ছাদে, যখন কেউই জানতে পারবে না...। আমার মা?

সঙ্গের লোকটা কে ছিল? লোকটা বলতে নেই, লোকটি, না, আমি তার মুখ দেখতে পাইনি। বেশ লম্বা ছিল সে, আমাদের ওখানকার এমএলএ জয়ন্ত সান্যাল লম্বাচওড়া, অশেষ দাশগুপ্ত নামে একজন ডাক্তার আসতেন মাঝে মাঝে, তিনি খুব ভদ্র ছিলেন, ভদ্র হলেই বা কী, ভদ্র মানুষরা দুশ্চরিত্র হয় না? কম্পাউন্ডার পুলকেশ, তেমন কিছু লম্বা নয়। মুক্তিবাহিনীর কেউ? কিংবা কলকাতা থেকে কোনও ব্যক্তি সেই রাত্রেই এসে ভোরবেলা ফিরে গেছেন, যাতে আমরা দেখতে না পাই?

এমএলএ ভদ্রলোককে মা পছন্দ করতেন না আমরা জানি। তাঁর সততা সম্পর্কে মায়ের মনে প্রশ্ন ছিল। একজন মানুষকে অসৎ জেনেও কি তাঁর সঙ্গে প্রেম করা যায়? যাবে না কেন, দু'জনে অসৎ হলেই বিবেক-টিবেকের আর প্রশ্ন আসে না। সেদিনের পর থেকে এই যাঁদের কথা বললাম, তাদের কারুকে

BanglaBook.org

মায়ের পাশে দাঁড়াতে দেখলেই আমি মনে মনে মিলিয়ে দেখতাম। কিছুতেই বুঝতে পারিনি।

সেই বয়েসে আমার জীবনে মায়ের স্থান ছিল ভগবানের পরেই। মায়ের পাশে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকতে কী আরাম লাগত। এক-এক সময় মা পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরতেন। যদি আমি দুষ্টুমি করতাম, মানে খেতে দেরি করতাম কিংবা জুতো ছুড়ে ছুড়ে খুলতাম, মা দু'-তিনবার বকুনি দিতেন, তারপরই আমার গালে গাল ঠেকিয়ে বলতেন, কী রে, তুই আমার কথা শুনবি না? ওই আদরটুকু পাওয়ার জন্যই তো দুষ্টুমি করতাম ইচ্ছে করে।

বাবা বেশির ভাগ সময়ই বাইরে থাকতেন, তাঁকে কাছে পেতাম না। মা-ই ছিল অতি আপন। সেই মা'র সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে লাগল। যখনই ভোররাতের ওই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ত, আমার পেট ব্যথার সময় মাকে বলতে পারিনি, তখনই আমার মনটা ঘুলিয়ে উঠত। আস্তে আস্তে মা সম্পর্কে আমার যা মনের ভাব তৈরি হল, তাকে কী বলব? ঘৃণা? হ্যাঁ, ঘৃণাই বোধহয়।

আমার জীবনে প্রথম এই ধরনের ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমি সতেরো বছর পেরিয়ে গেছি। তখনও থাকি বেলামাসির বাড়িতেই।

দাদা রয়ে গেল হস্টেলেই, স্কুল ছাড়ার পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। তার মধ্যে দাদা কিছুদিনের জন্য নকশাল আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিল। বিপ্লব শব্দটা তার খুব পছন্দ। কিন্তু দাদা সাবালক হয়ে উঠতে না-উঠতেই নকশাল আন্দোলন অনেকটা থিতিয়ে গেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দাদার বয়েস যদি আর পাঁচ বছর বেশি হত, তা হলে দাদা নির্ঘাত বিপ্লবের আদর্শ

BanglaBook.org

নিয়ে বেরিয়ে যেত বাড়ি ছেড়ে। বাড়ি সম্পর্কে দাদার আর কখনও সেরকম টান জন্মায়নি।

হস্টেলে থাকার সময় দাদা মাঝে মাঝে বেলামাসির বাড়ি চলে আসত চিংড়ি আর কইমাছ খাওয়ার জন্য। এই দুটো মাছ দাদার খুব প্রিয়, হস্টেলে এ মাছ দেয় না, যদিও এই দুটো মাছই সারা বছর পাওয়া যায়। আমাদের এখানে ঠাকুরকে বললে সে আলাদা কিছু রান্না করে দিত। দাদা আসত আগে থেকে খবর দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে আসত তার দু'-একজন বন্ধু।

তাদের মধ্যে একটা বন্ধু ছিল একেবারে পাগল। সে পড়ছে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তা ছাড়া কবিতা লেখে, গান গায়, মারামারি করে। তার সত্যি সত্যি নাম নাকি রাজা রামমোহন রায়, অবশ্য সবাই বলে রাজা রায়। এক-এক দিন রামমোহনের মতনই মাথায় বিরাট একটা পাগড়ি পরে চলে আসত। আর এক বন্ধু, তার নাম শান্তিভূষণ চুড়িয়াল, সে বেশ শান্ত। বিজ্ঞান ছাড়াও বাইরের বই পড়েছে প্রচুর।

আমার যেসব মাসতুতো বোন ও তাদের কয়েকজন বন্ধুও আড্ডা দিত মাঝে মাঝে, আমাকে ডাকতও তারা, কিন্তু ওদের আড্ডা কিছুক্ষণ বাদেই আমার একঘেয়ে লাগত। কারণ, ওরা বাইরের বইটই বেশি পড়ত না, আমি কোনও বইয়ের নাম বললেও বুঝতে পারত না। আমি আর দাদা, দু'জনেই বাচ্চা বয়েস থেকেই বইয়ের পোকা, বাংলা, ইংরেজি যাই-ই হোক। নতুন বই পেলে ভুলে যেতাম নাওয়া-খাওয়া।

মেয়েদের দলের আড্ডার চেয়ে দাদার বন্ধুদের আড্ডা আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হত। কারণ, ওরা কখনও রাজনীতি নিয়ে টেবিল ফাটাত, আবার কখনও কখনও বিজ্ঞান আর সাহিত্য

BanglaBook.org

নিয়েও এমন সব কথা বলত, যা আমার অজানা। রাজার কাছেই একদিন প্রথম শুনেছিলাম, এই মহাবিশ্ব এখনও বিস্ফারিত হচ্ছে। বিগ ব্যাং থিয়োরি অনুযায়ী, একটা সামান্য বিন্দুর বিস্ফোরণ থেকেই এই পৃথিবী, সূর্য-চন্দ্র-তারা আর গ্রহমণ্ডলী, আর আকাশে যে দেখতে পাই শত শত নক্ষত্রপুঞ্জ, সব কিছুর জন্ম। আবার এসবের সমষ্টি নিয়ে যে মহাকাশ, তা আরও বেড়ে চলেছে। যেদিন এই কথাটা শুনি, সেই রাত্তিরে আমার ঘুম আসেনি, চোখ বুজেও আমি শুধু আকাশ দেখছিলাম। এই আমাদের পৃথিবী, এত বড় সূর্য, আর এত অযুত-লক্ষ তারা, সব কিছুর জন্ম একটা সামান্য বিন্দু থেকে? তা হলে ভগবান, তিনিই কি এইসব...

ওই রাজা রায় আবার একটা অদ্ভুত কাণ্ডও করেছিল একদিন।

আমাদেরই বাড়ির বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল, হাতে একটা নতুন সাবান। হাতটা উঁচু করে সে জিজ্ঞেস করল, এই সাবানটা পুরো কে খেতে পারবে?

আমরা সবাই অবাক, সাবান খেতে হবে কেন? সাবান কেউ খায় নাকি? সাবান তো একটুখানি মুখে গেলেই বিশ্রী লাগে।

রাজা বলল, এই দেখো, আমি খাচ্ছি।

সে সত্যি সত্যি সাবানটা মুখের কাছে আনতেই দাদা বলে উঠল, এই রাজা, কী হচ্ছে কী?

রাজা বলল, দেখ না কী হয়!

দাদা বলল, রাখ ওটা। কী পাগলামি শুরু করেছিস!

রাজা ততক্ষণে সেই গায়ে-মাখার সাবানটা এক কামড় দিয়েছে। দাদা আর শান্তি আর আমার এক মাসতুতো দাদা অতীন—তিন

BanglaBook.org

জনে মিলে চেষ্টা করল ওর হাত থেকে সাবানটা কেড়ে নিতে, ও ততক্ষণে কচকচ করে অনেকটা খেয়ে ফেলেছে।

পুরোটা খেতে পারল না অবশ্য। গলায় আটকে গেল বোধহয়, একটা বোতল থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিয়ে খুব কাশতে লাগল।

তারপর হল এক কাণ্ড। ওর মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল সাবানের ফেনা, বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই, ঘরময় ছড়িয়ে গেল। আর রাজা কাশতে কাশতে বসে পড়ল এক সময়, শুয়েও পড়ল।

আমাদের ভয় হল, ডাক্তার ডাকতে হবে কিনা। তা অবশ্য হল না। একটু পরে ঘর আর নিজের জামাকাপড় নোংরা করে উঠে বসে ঢোঁক গিলল কয়েকবার। তারপর বলল, এবার ঠিক আছে। দে অরণ্য, একটা সিগারেট দে!

পরে যখন ওকে জিজ্ঞেস করা হল, এরকম নষ্টামি করার মানে কী? ও অম্লান বদনে বলল, আজকের তারিখটা মনে রাখ। এটা আমার জন্মদিন। প্রত্যেক দিনের জীবন কি রুটিন বাঁধা একই রকম চলবে? মাঝে মাঝে একটা ব্রেক দরকার। তোমাদের জীবনে আর কোনওদিন কোনও লোককে সাবান খেতে দেখবে না। তাই তোমাদের মনে থাকবে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র রাজা রায় তার জন্মদিনে কেক খায়নি, সাবান খেয়েছিল!

সত্যিই, সে ঘটনা কিছুতেই ভোলা যায় না।

এই রাজা একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ আমার ঘরে এসে হাজির। একা।

আমার সেই মাসির বাড়ি খানিকটা কনজারভেটিভ তো বটেই। তখনও বয়ফ্রেন্ড কথাটা ঠিক চালু হয়নি। বাঙালি মেয়েদের প্রেম করার জায়গা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর গঙ্গার ধারটার, আমি

কখনও যাইনি, গল্পে পড়েছি। দাদার বন্ধুদের সঙ্গে প্রেম করার অধিকার তো বাঙালি মেয়েদের আছেই, তা বলে বাড়ির মধ্যে, দুপুরবেলা?

তিনতলায় আমার ঘরটা খানিকটা একটেরেয়। জানলা দিয়ে অনেকখানি আকাশ তো বটেই, মিত্তিরদের বাড়ির একচিলতে বাগানও দেখা যায়। পড়তে পড়তে আমি কতরকম পাখির ডাক শুনি।

পাশের দুটো ঘর মাসতুতো ভাইবোনদের। তারা সবসময়ই কেউ না-কেউ থাকে। আজ কেউ নেই কেন? রাজা তিনতলায় উঠে এল, কেউ তাকে দেখল না? হয়, এক-এক দিন এরকম ব্যাখার অতীত ব্যাপারও ঘটে যায়।

প্যান্টের ওপর একটা হালকা নীল রঙের ফতুয়া পরেছে, কপালেও একটা অকারণে ফেট্টি বাঁধা। তিন-চারদিন দাড়ি কামায়নি। আমার পাশের চেয়ার সশব্দে টেনে নিয়ে বসে বলল, কী পড়ছ? যদি হিস্ট্রি বা ফিলোজফি হয়, তাও আমি পড়িয়ে দিতে পারি। সায়েন্স পড়ি বলে কি ওসব জানি না?

আমি বললাম, না, আমাকে কিছু পড়াতে হবে না।

রাজা বলল, আজ সকালে কী একটা মিরাকুলাস ব্যাপার হল জানো? চোখ মেলে প্রথম শব্দটাই বললাম, রেবেকা! কে রেবেকা, কেন রেবেকা, কোথায় রেবেকা কিছুই বুঝলাম না। একটু পরে মনে পড়ল, ওঃ হো, এই বিচ্ছিরি নামটা তো হরি ঘোষ স্ট্রিটের সেই টিপিক্যাল নর্থ ক্যালকাটার মেয়েটার!

রেবেকা নামটা খারাপ? সব নামই বাংলায় রাখতে হবে?

নিশ্চয়ই খারাপ! অতি খারাপ! আরও কিছু বলার আগে, আগে শুনি তোমার ও নাম কে রেখেছে?

BanglaBook.org

আমার ঠাকুমা নাম রেখেছিলেন রাধারানি। আর আমার বড়মামা এই রেবেকা নামটা রেখেছিলেন, তার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি, ইয়ে, স্বর্গে যান। তাই এ নাম বদলাবার আর কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

রাধারানিই তো চমৎকার নাম ছিল। রানিটা বাদ দিয়ে শুধু রাধা। রাধা কখনও পুরনো হয় না। এনি ওয়ে, বাথরুমে দাঁত মাজতে গেছি, তখনও মাথার মধ্যে ঝনঝন করছে, রেবেকা, রেবেকা! ব্যাপারটা কী? চা আর শোনপাপড়ি দিয়ে একটা পাঁউরুটি খাওয়ার পরও যখন নামটা গেল না, তখন ভাবলাম, একটা কিছু তো করা দরকার। হয় ওই মেয়েটার নামটা বদলাতে হবে, নয়তো ওর জীবনটাই বদলে দেওয়া যেতে পারে।

তোমার রাজা নামটাও তো বিচ্ছিরি। এ যুগে কারওর ওই নাম হয় নাকি? শুনলেই আমার, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, গজা গজা মনে হয়।

তোমার কি কোনওদিন সকালে প্রথম চোখ মেলার পরই রাজা নামটা মনে পড়েছে?

কোনওদিন না।

তা হলে কি রেবেকা নামের মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে নাকি? ধ্যাস শালা, আমি নিজে কিছু জানলাম না, অথচ একজনের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেল? তোমার কিছু হয়নি তো? তুমি কিছু ফিল করেছ?

ডেফিনিটলি নট!

গুড। তা হলে আমার কেন এই ফিলিং হচ্ছে, সেটা যাচাই করা দরকার। তাই না? তার আগে বুঝে নিতে হবে, তুমি মেয়েটা কেমন? মাঝে মাঝে আমাদের আড্ডায় এসে তুমি একপাশে

BanglaBook.org

বসে থাকো, চা-টা দাও, কিন্তু কোনওদিন তেমন কোনও কথা বলতে তো শুনিনি। কথা না শুনলে মালটা কেমন তা কী করে বোঝা যাবে?

এই, ওই ধরনের খারাপ শব্দ তুমি আমার সামনে বলবে না।

সরি। এমনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, খারাপ কিছু মিন করিনি। আচ্ছা, এটা বলো:

জানুয়ারি টেন, সিক্সটিন টেন

গ্যালিলিও গ্যালিলি অ্যাবলিশেজ হেভেন।—কার লেখা?

জানি না।

ব্রেখটের। ষোলোশো নয় কিংবা দশ সালে গ্যালিলিও প্রথম দূরবিন দিয়ে আকাশে... বাকিটা আশা করি আর বোঝাতে হবে না?

এখন বোঝাতে হবে না। পরে একদিন বরং ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ো।

আচ্ছা রেবেকা, এটা বলো:

যৌবনবেদনারসে-উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অন্য মনে গিয়েছ কি ভুলি—
হে ভোলা সন্ন্যাসী?
চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুকমঞ্জরী-সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি?
আশ্বিনের বৃষ্টি হারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?

রবীন্দ্রনাথ!

BanglaBook.org

রবীন্দ্রনাথ যে, তা তো দুটো শব্দ শুনলেই বোঝা যায়। কোন কবিতা? পড়েছ, না আন্দাজে ঢিল ছুড়লে?

পড়িনি। তবে শম্ভু মিত্রের গলায় একদিন আবৃত্তি শুনেছিলাম, দারুণ, সেটাই মনে গেঁথে গেছে। এই কবিতার নাম 'তপোভঙ্গ' তাই না?

রাইট। এবার বলো এটা কার:

গাছের পাতা ঝরে ঝরে একটা পাহাড় হয়ে গেছে
সেই পাহাড়ের পেটের মধ্যে একটা রুপোলি লাইট হাউজ
লিপ ইয়ারের রাত্তিরে সেই লাইট হাউজের ভেতর থেকে
একটা হারমোনির মতন শব্দ বেরিয়ে আসে...

জানি, জানি, এটা তোমার লেখা!

রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। রবীন্দ্রনাথের পরেই তো আমি। কিন্তু তুমি কী করে চিনতে পারলে? আগে পড়েছ?

না। এত বাজে কবিতা আর কে লিখবে? আর অন্য কারওর বাজে কবিতা তুমি মুখস্থই বা রাখবে কেন?

শাবাস! তোমার পোয়েট্রির সেন্স থাকুক না-থাকুক, ডিডাকশনের সেন্স আছে। সত্যি, আমি ভালো কবিতা লিখতে পারি না, নিজেও সেটা বুঝি, তবু এক-এক সময় লেখার জন্য এমন একটা আকুলিবিকুলি হয়! এই শোনো, তোমাকে যদি এক্ষুনি বেরোতে বলি, তা হলে চুল আঁচড়াতে-টাঁচড়াতে আর শাড়ি ফাড়ি বদলাতে কতটা সময় লাগবে? বাড়িতেও শাড়ি পরো কেন?

কোথায় বেরোব? বাইরে আকাশ খুব মেঘলা হয়ে আসছে দেখছি।

সেই জন্যই তো বেরোনো উচিত। চলো, নন্দলাল বসুর একটা

BanglaBook.org

ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে, সেটা দেখে আসি।

না, আমার এখন বেরোতে ইচ্ছে করছে না। ইন ফ্যাক্ট, আমার এখনও অনেক পড়াশুনো বাকি আছে।

তুমি কি আমাকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছ নাকি? নটি গার্ল! আসল কাজটাই তো হল না।

আসল কাজ মানে?

ওই যে ভালোবাসার ব্যাপারটা? কেন, রাজা রায়ের মতন একজন ব্যস্ত, ভার্সিটির ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি সকালবেলা ঘুম ভেঙেই ইডিয়টের মতন বিড়বিড় করবে, রেবেকা, রেবেকা?

রাজা এবারে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। আর কোনও কথা নেই।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। অস্বস্তিকর অবস্থা।

আমি বললাম, তোমার কপালের ওই বিশ্রী ফেট্টিটা খুলে ফেলো। এটা লাগিয়ে রাস্তা দিয়ে এলে কী করে?

রাজা বলল, লোকে তাকাচ্ছিল। পোশাকে-টোশাকে কিছু বৈশিষ্ট্য রাখার ঝোঁক থাকে ক্রিয়েটিভ লোকদের। সাধারণ লোকেরা কালারফুল পোশাক পরতে ভয় পায়। বেশির ভাগ বাঙালির তো রঙের কোনও সেন্সই নেই। সব ধুতিই সাদা। কেন, ধুতিও নানা রঙের হতে পারে না? তা যাক গে ওসব কথা। তা হলে ভালোবাসার ব্যাপারটা কী হবে?

আমি তা কী করে বলব?

তোমার কিছু হয়নি, মানে, ভালোবাসার ফিলিং...

ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না।

BanglaBook.org

জানো না? এত গল্প-উপন্যাস, কবিতা-টবিতা পড়ো!

সে সবও ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে।

আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলতে হবে না। হলে ঠিকই বুঝতে। যার প্রেম হয়, প্রথমবার, তার বুকে আতরের গন্ধ হয়। আমি তো এখান থেকে সেরকম গন্ধ পাচ্ছি না।

অনেকদিন আগেকার কথা। কথাবার্তাগুলো যে অবিকল এরকমই হয়েছিল, তা বোধহয় নয়, তবে এরকম অবাস্তব ধরনের কথা বলার দিকেই তার ঝোঁক ছিল।

যাই হোক, আসল কথাটা এবার বলি। সেটা স্পষ্ট মনে আছে।

সিগারেট শেষ করে রাজা আমার চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ বলল, এবার আমি তোমায় একটা চুমু খাব।

আমি প্রায় আঁতকে উঠে ছিটকে সরে গিয়ে বললাম, কী? না, না, সরে যাও এখান থেকে।

সে চোখের পাতা না ফেলে আবার খুব সরলভাবে বলল, আমি তোমাকে একটা চুমু খেতে চাই। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল।

বলছি না তুমি এখান থেকে সরে যাও!

আচ্ছা, আমি কথাটা অন্যভাবে সাজাচ্ছি। শ্রীমতী রাধারানি, আমি কি তোমার কাছ থেকে একটা চুম্বন পেতে পারি। মে আই বি পারমিটেড টু হ্যাভ আ কিস, প্লিজ?

নো, ইউ মে নট। প্লিজ লিভ মি অ্যালোন।

আরে শুধু একটা চুমু খেলে কী হয়েছে? চুমুর স্বাদ থেকেই বোঝা যায়, ভালোবাসা এসেছে কিনা।

কী করে বুঝবে? তুমি কি আগেও অন্য কারওকে, ইয়ে, ওই সব করেছ?

BanglaBook.org

অফ কোর্স! তুমি কী ভাবো আমাকে, মুখে দুধের গন্ধ নাকি? তবে আগে যতজনকেই চুমু খেয়েছি, বুঝেছি যে ভালোবাসার সেই স্বাদ নেই। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার... খাই একটা চুমু? বুকের গন্ধটাও একটু দেখতে হবে।

না, না, না!

এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে? এবার কি তা হলে একটু জোর করতে হবে?

আমি মাথাটা অনেকখানি সরিয়ে নিয়ে, রাজার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, জোর করবে? এবার হিংস্র নখ আর দাঁত বের করবে? অনেক পুরুষ এরকম করে শুনেছি। আমাদের সভ্যতা-ভদ্রতার এখানেই শেষ!

রাজা অট্টহাস্য করে বলল, আরে না, না, সেরকম জোর নয়। সবাই জানে, রাজা রামমোহন রায়ের বংশধর আর এম রয় ইজ, ইয়ে কী যেন বলে, ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। তবে প্রেমের ব্যাপারে প্রথমে একটু জোরজারি করলে মেয়েরা নাকি খুশি হয়। শ্যাল আই ট্রাই?

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেছি, তুমি আর কোনওদিন আমাকে এই ধরনের কথা বলবে না। প্লিজ, প্লিজ।

রাজা এমন বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যেন এমন অদ্ভুত কথা সে কখনও শোনেনি। এমন দৃশ্যও দেখেনি। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলেছিল, ওয়েল, এখন একটাই ব্যাপার দেখতে হবে। কাল সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই আমার রেবেকা নামটা মনে পড়ে কিনা?

BanglaBook.org

আর একটুও দেরি না করে রাজা ঝট করে চলে গেল। কোনওরকম বিদায়ও নিল না!

নিশ্চয়ই পরের দিন সকালে অন্য কোনও নাম মনে পড়েছিল, তাই রাজা ওইভাবে আর কখনও আমার কাছে আসেনি। তাকে আমার কখনও অসৎ-ও মনে হয়নি।

এর পরেও দু'বার আমার সঙ্গে প্রেমট্রেম করার ছলে দু'জন চুমু খেতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসে প্রসূন নামে একজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, তুমি কত মেয়েকে চুমু খেয়েছ, তাদের নাম নোটবইতে লিখে রাখো বুঝি? এর উত্তরে প্রসূন তেতো গলায় বলেছিল, হ্যাঁ, লিখে রাখি। তবে তোমার মতন ফ্রিজিড মেয়ে আমি আগে কখনও দেখিনি।

ফ্রিজিড?

কথাটা আমাকে খুব ধাক্কা দিয়েছিল। সত্যিই কি আমি তাই? আমি কি একটা সাইকোলজিক্যাল কেস? ফ্রয়েডের থিয়োরির জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ? বাচ্চা বয়েসে নিজের মাকে একজন পরপুরুষের সঙ্গে ওইসব করতে দেখে আমার মধ্যে একটা মানসিক শীতলতা এসে গেছে?

কোনও পুরুষের সঙ্গে আমার কখনও ঘনিষ্ঠ হতে ইচ্ছে করে না কেন? বাচ্চা বয়সে দেখা কোনও দৃশ্যের ধাক্কা মানুষকে নাকি সারাজীবন বদলে দিতে পারে?

আমাকে দেখতে কেমন? বিউটি ইজ ইন দা আইজ অফ দা বিহোল্ডার। আমার মা বিখ্যাত সুন্দরী। তাঁর মেয়ে হিসেবে আমাকেও তো কেউ অসুন্দর বলে না। হয়তো, মায়ের মতন স্পেশাল গ্ল্যামার আমার নেই। তবে, আমি অ্যাডাল্ট হওয়ার পর মা ও আমি পাশাপাশি হেঁটে গেলে কেউ কেউ বলত, ঠিক যেন

BanglaBook.org

দু'বোন। (কথাটা আমার মোটেই পছন্দ হত না যদিও)।

অর্থাৎ আমি একটা প্রেজেন্টেবল চেহারার মেয়ে, অথচ কোনও ছেলের সঙ্গে প্রেম বা ওইসব কিছু করি না। তা হলে আমি ফ্রিজিড। আমার চিকিৎসার দরকার।

কাউকে কিছু না বলে আমি নিজেই চিকিৎসা করা শুরু করলাম।

প্রথমে আমি ফ্রয়েডের রচনা ইংরেজি বাংলায় যত পাওয়া যায়, জোগাড় করে পড়ে নিলাম। বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম মানসিক বিকৃতির ব্যাপারটা কী। তারপর পড়তে লাগলাম অন্যরকম বই।

হেনরি মিলারের 'ট্রপিক অফ ক্যান্সার' উপন্যাসটা আমি আগে পাঁচ পাতা অবধি পড়েই সরিয়ে দিয়েছিলাম। এখন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়লাম আবার। আর কয়েক পাতা এগোবার পর আর ছাড়তে পারি না। আস্তে আস্তে আমার কান গরম হতে লাগল, আঙুলের ডগা, সারা শরীর জ্বালা করতে লাগল। শরীর, শরীর ছাড়া আর তখন আমার মাথার মধ্যে কিছু নেই। চোখের সামনে তৈরি হল আস্ত একটা পুরুষের শরীর আর তার মুখটা চেনা।

'পারফিউম গার্ডেন' নামেও একটা চিনে না জাপানি উপন্যাসের অনুবাদ তখন অনেকেই পড়ত লুকিয়ে। সেটা একটা পর্নোগ্রাফির হদ্দ। ওসব বই আগে আমার ছুঁতেই ইচ্ছে করত না, এখন জোর করে পড়ে দেখলাম, নারী-পুরুষের মিলন দৃশ্যের রগরগে বর্ণনার সময় আমার শরীরে যথেষ্ট উত্তাপ আসে, তারপর অসহ্য একটা লোভের মতন ব্যাপার হয়।

BanglaBook.org

ওই বইটা পড়তে পড়তেই একদিন আমি বাথরুমে ছুটে গিয়ে,

আগে কোনওদিন যা করিনি, তাই করে ফেললাম। বলতে গেলে প্রায় নিজেরই অজ্ঞাতসারে।

বাংলায় এরকম কিছু বই আছে কিনা আমি জানি না। অন্তত আমার হাতে আসেনি। যাই হোক, প্রমাণ হয়ে গেল যে আমার শরীর ঠান্ডা নয়। কিন্তু এটা তো থিয়োরিটিক্যাল প্রমাণ, এর বাস্তব প্রয়োগ? তার জন্য আরও দু'বছর দেরি করতে হল, কারণ আমি তো কারওর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই বলতে পারি না, তোমাকে একবার চুমু খেয়ে দেখব?

ততদিনে রাজা রায় যাদবপুর ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে গেছে। তার সঙ্গে এই সময় আবার দেখা হলে কী হত বলা যায় না, কিন্তু তার সঙ্গে আর সারাজীবনেই দেখা হয়নি।

আমার প্রথম চাকরি বেঙ্গালুরুতে। তখনও আইটি সেক্টরের জোয়ার শুরু হয়নি, কিন্তু বেঙ্গালুরু একটা পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহর আর মনোরম আবহাওয়ার জন্য ভারতের অনেক বড় বড় কোম্পানির হেড অফিস চলে যাচ্ছে সেখানে। চাকরিরও সুযোগ অনেক।

আমি একটা বিখ্যাত বিজ্ঞাপন কোম্পানির অন্যতম কপি রাইটার হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। কলকাতাতেও এই কাজ আমি করেছি কিছু কিছু, কিন্তু তখন তো নকশাল আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আফিস পাড়া দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে, বিমান কোম্পানিগুলোও ডানা গুটিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য শহরে।

আমি একটা সিঙ্গল রুম ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলাম, উইথ বাথরুম অ্যান্ড কিচেন। সেই প্রথম আমার রান্নারও হাতেখড়ি। সব কিছু আমার নিজের ইচ্ছে মতন, অফিসেও আমার কাজের চাপ কম, কেউ আমার ওপর খবরদারি করে না। আঃ, সেই দু'বছর,

BanglaBook.org

প্রিসাইসলি এক বছর আট মাস, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় মনে হয়। তারপরেও যে আমার কখনও কখনও খুব আনন্দময় সময় কাটেনি, তা নয়, তবু প্রায়ই মনে হয়, বেঙ্গালুরুর ওই দু'বছরের জীবনে যদি ফিরে যাওয়া যেত! তখন আমি জীবনে প্রথম পেয়েছিলাম স্বাধীনতার স্বাদ।

গুনির সঙ্গে সেখানেই আমার আলাপ। ওর পুরো নাম গুণশেখরন, ও কিন্তু আমার অফিসের সহকর্মী নয়, কাছাকাছি অন্য অফিস। ছুটির পর দেখা হত মাঝে মাঝে, একই বাসে উঠতাম দু'জনে। প্রথমে মুখচেনা, তারপর একটা-দুটো কথা, তারপর একটু ঘনিষ্ঠতা। এভাবেই কেটে গিয়েছিল প্রায় ছ'মাস। ও কিন্তু মোটেই আমার গায়ে-পড়ে আলাপ করতে আসেনি, আমাকে কখনও অনুসরণও করেনি, খুব কঠোরভাবে সভ্য সমাজের নিয়ম মেনে চলেছে।

এরপর যখন আমরা ছুটির পরে কোথাও কফি খেতে বসতাম, তখন দেখা গেল, আমাদের দু'জনের চিন্তাধারার মধ্যে বেশ মিল আছে। কথার পিঠে কথা বলা যায়। সে তখন অ্যাসট্রোফিজিকস নিয়ে গবেষণা করছে। তা ছাড়া গুণশেখরন অন্য দিক দিয়েও একজন গুণী।

সেরকমই একদিন, কফির দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময় ব্যাগ থেকে একটা কার্ড, একটা আমন্ত্রণপত্র, বার করে সে বলল, আমাদের একটা ক্লাব আছে, সেই ক্লাবের অনুষ্ঠান এই শনিবার। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তো এসো।

কার্ডটা হাতে নিয়ে প্রথমে আমার ভুরু কুঁচকে গেল। পুরোপুরি কর্নাটকের ভাষা, অর্থাৎ কন্নড় ভাষায় লেখা, যার একবর্ণও আমার বোঝার সাধ্য নেই।

BanglaBook.org

গুনি কার্ডটা উলটে দিল। উলটোদিকে অবশ্য ইংরেজি।

তোমাকে আসতেই হবে, কিংবা এলে খুব খুশি হব, এরকম কিছু বলেনি সে। শুকনো আমন্ত্রণ। না গেলেও হয়। তবু যে আমি কেন গেলাম, তা আজও জানি না।

গিয়ে খুব জব্দ। সমস্ত অনুষ্ঠানই কন্নড় ভাষায়। প্রথমে এক সাহিত্যিকের বক্তৃতা, তারপর আরও কিছু কথাবার্তা, এবং নাটক। সামাজিক নাটক, তাতে দুটি মেয়ের মাঝে মাঝে কান্নাকাটি ছাড়া আর কিছুই আমার বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। নাটকটির আঙ্গিক নতুন ধরনের, মাঝে মাঝে অপেরার মতন, কিছু সংলাপ গদ্যে, কিছু গানে, এক জায়গায়, রাস্তায় একটা মারামারির দৃশ্য পুরোপুরি নাচের ভঙ্গিতে কম্পোজ করা। মাঝে মাঝে একজন সূত্রধার এসে কিছু বলে যাচ্ছে, তাও গানে।

প্রথমবার ধরতে পারিনি। মাথায় লম্বা টুপি, গায়ে লাল রঙের পোশাক পরা সূত্রধারটি তো গুণশেখরন! গানের কথা বুঝতে পারছি না, কিন্তু গলার সুর শুনেই বোঝা যায়, সে ভালো গায়ক। প্রতিটি গানের পর প্রবল হাততালি। আমার বন্ধুটি তার এই গুণের কথা কোনওদিন উল্লেখও করেনি।

যে-নাটকের ভাষা একটুও বোঝা যায় না, সে নাটক পুরোটা বসে দেখা খুবই দুষ্কর। তবু আমি বসে রইলাম, কিছুটা ভদ্রতাবশত, কিছুটা গান শোনার জন্য। নাটক শেষ হল, সূত্রধারেরই গান দিয়ে।

পরদা পড়া, দর্শকদের হাততালিতে আবার পরদা ওঠা, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্যান্যরা সামনে এসে অভিবাদন, আবার হাততালি। এইসব শেষ হতেই বেশ কিছু ছেলেমেয়ে মঞ্চে উঠে গেল অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য। আমি লক্ষ করলাম,

BanglaBook.org

গুণশেখরনকেই ঘিরে ধরেছে বেশি ছেলেমেয়ে।

এর পর যা ঘটল, তার মূল্য আমার জীবনে খুব বেশি।

আমি হল ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছি, গুণমুগ্ধ ও স্তাবকদের ভিড় ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে গুনি চেঁচিয়ে বলল, মিজ দত্তা, প্লিজ ওয়েট, আমি আপনার সঙ্গেই যাব। ওয়ান মিনিট, প্লিজ।

থিয়েটারের রাত্তিরে কতরকম উত্তেজনা থাকে। কত মানুষ এসে প্রশংসা জানাবে, এর পরে ওদের দলের পার্টি থাকতে পারে, সেসব ছেড়ে ও যে আমার সঙ্গেই আসতে চাইল, এটা কিছুটা আশ্চর্যজনক তো বটেই। আমার প্রতি বিশেষ সম্মান জানানোও তো নিশ্চয়ই।

খুব তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল গুনি। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরলাম।

খুব একটা উচ্ছ্বসিত না হয়ে আমি বললাম, নাটকটা তো ঠিক বুঝিনি, ভাষার জন্য, তবে নতুন ধরনের মনে হল, আর তুমি যে কত ভালো গান করো... আমাকে চমকে দিয়েছ... ছোটবেলা থেকেই গান শিখেছ বুঝি?

গুনি বলল, না, শিখিনি সেরকম ভাবে। শুনে শুনে, নিজের শখেই গাই। রেবেকা, তুমি যে এসেছ, তাতে মনে হচ্ছিল, হলের মধ্যে মাত্র একজনই শ্রোতা, তুমি, শুধু তোমাকে শোনাবার জন্যই গাইছি।

আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। মিথ্যে বলছে? এতখানি বাড়িয়ে বলছে? তা হলে ও আজকের দিনেও আমার সঙ্গে আসতে চাইল কেন?

এতদিনে আমি গুনিকে একবারও আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে বলিনি। গুনিও ওর অ্যাপার্টমেন্টে ডাকেনি আমাকে,

BanglaBook.org

শুনেছি সে-ও এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করে একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। ট্যাক্সিতে এলে ও আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। কোনও কোনও দিন, একটু ঘুরপথ হলেও আমি ওকে নামিয়ে দিয়ে আসি, নইলে ট্যাক্সি ভাড়াটা শেয়ার করা যায় না।

বাড়ির কাছাকাছি এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজ তোমাদের ক্লাবের পার্টি নেই?

গুনি মৃদু স্বরে বলল, আছে। আমি যাব না বলে এসেছি।

কেন গেলে না? শুধু শুধু আমার সঙ্গে?

শুধু শুধু কেন হবে?

এখন কী করবে, বাড়ি চলে যাবে?

বোধহয় তাই-ই যাব।

আমার ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায় ট্যাক্সিটা থামার পর ও আমার মুখের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, শুভরাত্রি।

আমি বললাম, যদি কফি খেতে চাও, ওপরে এলে খাওয়াতে পারি। আমার কাছে কিন্তু অন্য ড্রিঙ্কস কিছু নেই।

গুনি বলল, কফি উইল বি ফাইন।

কফি মেকারে চট করে কফি হয়ে গেল, এক কাপ। আমি এদের মতন সব সময় কফি খেতে পারি না, আমার চা-ই পছন্দ।

গুনি ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে আমার যেখানে সেখানে ছড়ানো বইপত্র দেখতে লাগল। আমার খাবার টেবিলটা বলা যায় এক বিঘত। দু'জনের চা ও কফি পানের পর বসে রইলাম মুখোমুখি।

গুনি বরাবরই অল্পভাষী। আমি আর কী বলব খুঁজে পেলাম না।

জানলা দিয়ে দেখা যায়, বাইরের শীতের রাত। আকাশ

BanglaBook.org

পরিষ্কার, কয়েকটা তারাও ফুটে আছে। দেখা যাচ্ছে বেঙ্গালুরুর আলোকোজ্জ্বল কিছুটা অংশ। সাড়ে ন'টা-পৌনে দশটা, এ শহর শনিবার অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। গাড়ি চলাচল দিয়েই বোঝা যায়।

আমরা দু'জনে চেয়ে রইলাম দু'জনের দিকে। কোনও কথা নেই।

ঘরটা এতই নিস্তব্ধ যে একটা-দুটো মশা থাকলেও পিনপিন শোনা যেত। না, মশা নেই।

গুনির ঠোঁটে একটু একটু খালি হাসি, আমার ঠোঁটটা কেমন কে জানে। কথা বলছি না, চোখও সরিয়ে নিচ্ছি না। এবং আমি জানি, আমি একবার একটু ছোট্ট হাই তুললেই ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবে!

এরকমভাবে কতটা সময় কেটে গেল জানি না। একসময়, মোটেই সচেতনভাবে নয়, হঠাৎই আমি ওই ছোট্ট টেবিলটার ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে ওর ঠোঁটে একটা চুমু দিলাম।

হ্যাঁ, আমিই প্রথম।

তারপর ও উঠে দাঁড়াল। আমার একটা হাত ধরে বলল, এসো!

ওঃ, কী সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু হল এরপর। পরের চুমুটায় যেন আমাদের যত বছরের সংযমের তৃষ্ণা জমে ছিল সব যেন উত্তাল হয়ে উঠল। শরীরে জ্বালা জ্বালা ভাব।

এইভাবে কতক্ষণ যে সে চুম্বন প্রলম্বিত হয়েছিল, তা বলতে পারি না। তারপর আবার। এর মধ্যে গুনি একবার বলল, তোমার বুকে কী সুন্দর গন্ধ!

তার সঙ্গে আমার এতদিনের পরিচয়ের পর এই একটিই মাত্র

BanglaBook.org

প্রেমের বাক্য সে উচ্চারণ করেছিল।

কী যেন বলে সব, ট্রমা, অবসেশন, ফিক্সেশন, এইসব ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের কোনও ধারাই আমার প্রতি প্রযোজ্য নয়। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক এক নারী। এর পরেও আমার তিন-চারজনের সঙ্গে...। সেই বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকেই শিক্ষিত কুমারী মেয়েদের যৌন-নীতিবোধ অনেকটাই বদলে যেতে শুরু করেছে। প্রি-ম্যারিটাল সেক্স সম্পর্কে বিধিনিষেধ অনেকেই মানতে চাইছে না।

তবু আমি মাকে ক্ষমা করতে পারিনি। মা একজন বিবাহিত মহিলা, তাঁর স্বামীর একটা বিশেষ সামাজিক পরিচিতি আছে। তাঁর সাড়ে ন'বছর বয়েসের মেয়ে যখন সদ্য রজঃস্বলা হচ্ছে, সেই সময় তাদের মনের অবস্থা কত বিপজ্জনক থাকে, তখনও সেই মেয়ে মায়ের সঙ্গ পাবে না, মা তখন পরপুরুষের সঙ্গে, তাও ছাদে লুকিয়ে লুকিয়ে... ছিঃ!

সাত

চাকরিজীবন পরিপূর্ণ হবার আগেই বীরেশ্বর দত্ত পদত্যাগ করলেন।

স্বাস্থ্যের কারণ ছাড়া, কোনও গুরুতর অভিযোগ থাকলে তা প্রকাশ্যে জানানো যায় না, এরকম মন্ত্রগুপ্তি নিতে হয় উচ্চপদস্থ অফিসারদের।

বীরেশ্বরের অটুট স্বাস্থ্য, বয়েস বোঝাই যায় না, সুতরাং কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল, ইন্দিরা গাঁধীর জরুরি অবস্থা

BanglaBook.org

জারির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতাই তাঁর পদত্যাগের আসল কারণ।

বাংলাদেশ যুদ্ধ জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী কোনওরকম দম্ভোক্তি কিংবা অশোভন আস্ফালন করেননি, বরং অত্যন্ত সংযতভাবে সঠিক বার্তা পাঠিয়েছেন দেশবাসীর প্রতি। তিনি বলেছিলেন, এ যুদ্ধ জয় কিছুই নয়, এখনও অনেক যুদ্ধ বাকি আছে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সেইসব কঠিন যুদ্ধেই হবে আমাদের আসল পরীক্ষা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তি সামরিক দিক থেকেও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মাত্র বারো দিনে এত বড় একটা যুদ্ধ শেষ, তাও দু'দিকের ফ্রন্টে।

তারপর নতুন দেশটি থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা আর নব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের সুষ্ঠুভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারও পৃথিবীর অনেক দেশ কুটিলভাবে লক্ষ করছিল, তেমন কোনও খুঁত পাওয়া যায়নি।

এইসবের জন্য ইন্দিরা গাঁধী যতটা সুনাম অর্জন করেছিলেন, কর্পূরের মতন তা উবে যেতেও বেশি দেরি হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম প্রধান নায়ক চার্চিল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন।

আর এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক বিচারক, বলা যায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই রায় দিয়ে বসলেন যে, আগের নির্বাচনে ইন্দিরা গাঁধীর লোকসভার জয় বাতিল। কারণ তিনি কিছু সরকারি সুযোগ-সুবিধে নিয়েছেন নির্বাচনের সময়।

ভারতীয় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দল এতরকম দুর্নীতির আশ্রয়

BanglaBook.org

নেয় যে সেই তুলনায় ইন্দিরা গাঁধীর নামে এটা-সেটা অভিযোগ বেশ তুচ্ছই মনে হয়। তার জন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন খারিজ! এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকের আরও নির্দেশ, এর পর আর ছ'বছর ইন্দিরা গাঁধী নির্বাচনে অংশগ্রহণই করতে পারবেন না!

সারা দেশ স্তম্ভিত। আবার এর মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিক্ষোভ, মিছিল ও সত্যাগ্রহে উত্তর ভারত উত্তাল।

বীরেশ্বর সাধারণত বাড়িতে এসে অফিসের কথা আলোচনা করেন না। এমনিতেই মানুষটি চুপচাপ স্বভাবের।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছুটা দৈনন্দিন কথাবার্তা তো থাকেই, নইলে দাম্পত্য সম্পর্ক টেকে কী করে?

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে তাদের কলকাতা থেকে আনা হয়নি, দিল্লিতে শুধু স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার। বীরেশ্বর অফিসের কাজে খুবই ব্যস্ত থাকেন, এক-এক দিন ফিরতে ফিরতে রাত দশটাও হয়ে যায়। গত দু'-তিন দিন দেরি করে অফিস থেকে ফিরেও একা একা গুম হয়ে বসে থাকছেন। সামনে হুইস্কির গেলাস। বীরেশ্বর মদ্যপ নন, খুব সংযতভাবে অল্প মাত্রায় পান করেন। কোনও পার্টিতে বন্ধু-বান্ধব জোর করলেও তিনি গেলাস সরিয়ে নেন।

কিন্তু গতকাল তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, বাথরুমে গিয়ে কিছুক্ষণ প্রলাপ বকার মতন কী যেন বলছিলেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। তারপর তাঁর বমি করার শব্দ পেয়ে বসুধা দরজায় ধাক্কা দেন।

আজও বাড়ি ফিরে, বসুধা দরজা খুলতেই শুধু শুকনো গলায় বললেন, রামবিলাসকে দিয়ে দুটো সোডা আনিয়ে রাখো, আর আমাকে তোয়ালে দাও, যা গরম আজ!

জুন মাস, দিল্লিতে অসহ্য গরম, বৃষ্টির দেখা নেই তো বটেই,

BanglaBook.org

তীব্র জলকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির কল নিঃসাড়, পয়সা দিয়ে ঘড়া ঘড়া জল কিনতে হয়।

বসুধা বাথরুমের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, স্বামী স্নান সেরে বেরোতেই বসুধা অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে বলো তো?

এসব ক্ষেত্রে সব স্বামীই একই কথা বলে, কই কিছু হয়নি তো?

অনেক স্ত্রীই এরপর বলে, তুমি আবার রাগ করেছ কোনও কারণে? আমি কি কোনও দোষ করেছি?

বীরেশ্বর কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, না, না, তুমি দোষ করবে কেন? বরং আমিই, না, না, কিচ্ছু হয়নি, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি এখন একটু চা খাব।

বসুধা স্বামীর পথ আটকে দাঁড়িয়ে বললেন, না, কী হয়েছে, তোমাকে বলতেই হবে। তোমাকে আমি আগে কখনও এরকম ব্যবহার করতে দেখিনি। কাল তুমি ঘুমের মধ্যেও কীসব বলছিলে।

বীরেশ্বর বললেন, তাই নাকি? হ্যাঁ, মাথাটা গরম হয়ে আছে ক'দিন ধরে। সুধা, আমি চাকরি থেকে রেজিগনেশন দেব বলে ভাবছি।

কেন, অফিসে কিছু গন্ডগোল হয়েছে?

না। অফিসে নয়, গন্ডগোল তো চলেছে সারা দেশে। এবার বুঝি এ দেশটা উচ্ছন্নে যাবে।

একটু বাদে চায়ের টেবিলে বসে বীরেশ্বর বললেন, সুধা, তুমি তো ইন্দিরা গাঁধীর খুব ভক্ত ছিলে। ইন্দিরা গাঁধীর এখন কী করা উচিত বলো তো?

BanglaBook.org

বসুধা বললেন, দেখো, ইলেকশনের সময়, মানে ক্যাম্পেনের সময় কোথা থেকে প্রাইম মিনিস্টারের মাইক্রোফোনের ইলেকট্রিক কানেকশন নেওয়া হল কিংবা কোন গভর্নমেন্ট অফিসার নিজের কাজ ফেলে প্রায়ই ওঁর কাজ করতেন, সে জন্য কি সরাসরি উনি দায়ী! এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিল...

বীরেশ্বর বললেন, শোনো, আইন হচ্ছে আইন। আদালতের নির্দেশ নিয়ে তর্ক করা যায় না, তার জন্য আবার আইনের পথেই যেতে হয়। এই মুহূর্তে, ধরো, তুমি যদি ইন্দিরা গাঁধী হতে, তুমি কী করতে?

ভুরু কুঁচকে, হাসি হাসি মুখে একটু চিন্তা করে বসুধা বললেন, আমি হলে বাবা পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে নেমে আসতাম।

বীরেশ্বর ক্রুদ্ধ মুখে বললেন, একজ্যাক্টলি! এখন পদত্যাগই ওঁকে মানায়। তা হলে কী হত বলো তো? যে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এতদিন ধরে চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই গণতন্ত্রেরই জয় হত! সারা পৃথিবীতেই আমরা...দেখো না, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নামগন্ধ নেই, বারবার সামরিক শাসন। আর বাংলাদেশেও, শেখ মুজিব ফিরে এলেন পাকিস্তানের জেল থেকে, অসাধারণ তাঁর জনপ্রিয়তা, কিন্তু তিনি গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করেও সামলাতে পারছেন কোথায়? এখন একদলীয় শাসন চালাতে চাইছেন, সারা দেশে সেন্সরশিপ জারি করেছেন।

বসুধা বললেন, দেখো, বিরোধী দলের নেতা হয়ে আন্দোলন করা আর দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশ চালানো, অনেক তফাত, তাই না?

বীরেশ্বর বললেন, ঠিক আছে, ওদের কথা থাক। আমাদের

BanglaBook.org

দেশে যে এত কষ্টে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, সারা পৃথিবীই সেটা স্বীকার করে, সেটাও এবার নষ্ট হবে? ইন্দিরা গাঁধী সেটাই এবার করতে চলেছেন।

তার মানে?

ব্যাপারটা খুব গোপন। তুমি এ নিয়ে আর কারওর সঙ্গে আলোচনা করবে না। ইন্দিরা গাঁধী গদি ছাড়বেন না। দু'-চারদিনের মধ্যেই উনি স্টেট অফ এমার্জেন্সি জারি করতে চলেছেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আর দু'-চারজন তাঁকে এই পরামর্শই দিচ্ছেন।

বসুধার মুখে একটা ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়?

অনেক বাঙালির কাছেই তখন এই নামটি উচ্চারিত হলেই এক রক্তচক্ষু, রক্তাক্ত শাসকের ছবি ফুটে ওঠে। দু'-এক বছর আগেই পশ্চিম বাংলায় তাঁর নির্দেশে কয়েক হাজার যুবককে নকশাল নাম দিয়ে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। বসুধার এক খুড়তুতো ভাই অর্ণবও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে বরানগরে। অর্ণব অবশ্য অ্যাক্টিভ নকশাল ছিল না, তবে তার দু'-একজন বন্ধুকে বাড়িতে আশ্রয় দিত।

বসুধা বললেন, অর্ণব দু'হাত তুলে সারেন্ডার করতে চেয়েছিল, তবু তাকে...

বীরেশ্বর স্বভাবোচিত নম্রতার বদলে চেঁচিয়ে ওঠে বললেন, ব্রুট্‌স! ব্রুট্‌স!

চা শেষ না করেই একটা গেলাসে হুইস্কি ঢেলে তিনি বললেন, আমরা সরকারি অফিসার। উই আর নট পলিসি মেকার্স। আমাদের যা নির্দেশ দেওয়া হবে, সেসব পালন করাই আমাদের কাজ। কিন্তু কোনও কাজে যদি বিবেকের সায় না দেয়? প্রকাশ্যে

BanglaBook.org

প্রতিবাদ করার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু পদত্যাগ তো করতে পারি। যদি খাওয়াপরার চিন্তা না থাকে!

বসুধা বললেন, ছেড়ে দাও কাজ!

বীরেশ্বর বললেন, আমরা কলিগদের সঙ্গে রোজ এই ব্যাপারে তর্ক হচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার কী জানো, ওরা অনেকেই এমার্জেন্সির সাপোর্টার। তারা বলছে, এই মুহূর্তে ম্যাডাম গাঁধী সরে গেলে সারা দেশে চরম অরাজকতা শুরু হবে। তারপর হয়তো আর্মি রুল কিংবা ডিক্টেটরশিপ এসে পড়বে। সেটা আটকাবার জন্যই ইন্দিরা গাঁধীর থাকা দরকার। বাজে কথা! বাজে কথা! ইন্দিরা গাঁধীর কংগ্রেসের এখন যা অবস্থা, ইলেকশন হলেই হারবে। তাই তো এমারজেন্সি জারি করে ইলেকশন সাপ্রেস করা হচ্ছে।

বসুধা স্বামীর বাহু ছুঁয়ে বললেন, তুমি আর এ নিয়ে মাথা গরম কোরো না। চাকরি ছাড়তে হয় ছাড়বে। চলো, আজ আমরা একটা সিনেমা দেখে আসি।

বীরেশ্বর বললেন, সিনেমা? কিচ্ছু মাথায় ঢুকবে না। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, এই গরমের মধ্যে বাড়িতে বসে না থেকে চলো, বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। সূরযকুণ্ড যাবে?

একটু বাদেই বেরিয়ে পড়লেন দু'জনে। ড্রাইভারের ছুটি, বীরেশ্বরই গাড়ি চালাচ্ছেন। ইন্ডিয়া গেটের কাছে এসে মনে হল, গোটা দিল্লিই যেন ঘর ছেড়ে পথে নেমে পড়েছে। একেবারে লোকে লোকারণ্য। কোনও মিটিং-এই এত মানুষ হয় না। আকাশের এক কোণে একটুকরো মেঘ।

এই গরমে ইন্দিরা গাঁধীরই বা মাথা ঠান্ডা থাকবে কী করে?

অনেকে আশা করেছিল, শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ নিয়ে আপত্তি তুলবেন,

BanglaBook.org

কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না, তিনি তোতাপাখির মতন ঘোষণাটি সেরে দিলেন। এতে সংবিধান অস্বীকার করা হল না বটে, তবে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপন্ন এই অজুহাতে ইন্দিরা গাঁধীকে দেওয়া হল প্রচুর ক্ষমতা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মতন কিছু কিছু নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।

একুশ মাস ধরে চলেছিল এই জরুরি অবস্থা। এর মধ্যে বিরোধী, প্রতিবাদী নেতাদের আন্দোলনে ভরে গেল জেলখানা। জয়প্রকাশ নারায়ণ পেলেন জাতীয় নেতার সম্মান, পঞ্জাবের শিখরা সরব হল সবচেয়ে বেশি।

শেষপর্যন্ত ইন্দিরা গাঁধী জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নির্বাচন ঘোষণা করলেন। সেই নির্বাচনে তাঁর দলের ভরাডুবি হল, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন। এমনকী একসময় তাঁকে জেলেও যেতে হল।

তিনি আবার এক নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন বটে, তার পরে তাঁর পরিণতি কী হল, তার সঙ্গে এই কাহিনির কোনও সম্পর্ক নেই।

১৯৭৫-এর ২৫ জুন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হল, সেদিনই দুপুরে বীরেশ্বর বাড়ি ফিরে এসে বেশ মুক্ত গলায় বললেন, সুধা, এবার পোঁটলাপুঁটলি গোটাও। আমাদের দিল্লি ছাড়ার সময় হয়ে গেল।

বসুধা উৎফুল্লভাবে বললেন, খুব ভালো হবে। কলকাতায় দারুণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমরা শান্তিনিকেতনের গেস্ট হাউসে গিয়ে বারান্দায় বসে বর্ষা দেখব।

তবে সঙ্গে সঙ্গেই তো যাওয়া যায় না। বসুধাও এর আগে কয়েকবার এসে থেকেছেন দিল্লিতে। এবার পাকাপাকি গুটোতে

BanglaBook.org

হবে সংসার। তা ছাড়া বসুধা এখানে এসে অলস বসে থাকেন না, চিত্তরঞ্জন কলোনিতে একটা প্রাইমারি স্কুলে বিনা পয়সায় পড়ান, মহিলা বন্দিদের মুক্তি-আন্দোলনের এক সমিতির তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেসব থেকেও মুক্ত করতে হবে নিজেকে।

দু'দিন পরে বসুধার নামে একটা আমন্ত্রণপত্র এল প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে। প্রায় একটি ঘরোয়া নাচ-গানের অনুষ্ঠানের কার্ডটির এক কোণে প্রধানমন্ত্রীর নিজের হাতে লেখা, প্লিজ কাম!

সেই একাত্তর সালে কবুতরহাটিতে শরণার্থীদের সেবাশিবিরে যে দেখা হয়েছিল, তা ইন্দিরা গাঁধীর মনে রাখার কথা নয়। তবে দিল্লিতে থাকার সময় মাঝে মাঝে পার্টিতে দেখা হয়েছে, নতুন করে আলাপ ঝালিয়ে নেওয়া হয়েছে। দেখা হলে চিনতে পারেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ির ঘরোয়া গান-বাজনার আসরে বসুধাকে আমন্ত্রণ জানান।

এই আমন্ত্রণপত্রটি কি বীরেশ্বরের পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার আগেই পাঠানো হয়েছে?

বসুধা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কি যাওয়া উচিত?

বীরেশ্বর সহাস্যে বললেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা! আমার এই চার দেওয়ালের মধ্যে এমার্জেন্সি জারি নেই। তোমার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী তুমি ঠিক করবে।

বসুধা ইতস্তত করে বলল, উনি নিশ্চয়ই তোমার ওপর বেশ বিরক্ত হয়ে আছেন এখন।

বীরেশ্বর বললেন, শুধু উনি কেন, ওঁর আঙ্গোপাঙ্গরাই বেশি চটে আছে। এ দেশে কর্তাভজার দলের সংখ্যাই তো বেশি। সবাই হেঁ হেঁ করে। তুমি ভাবতে পারবে না, কংগ্রেসের কত বড় বড় নেতা, ওঁর থেকে বয়েসে বড়, তাঁরাও...

BanglaBook.org

সন্ধেবেলা ফোন করলেন অনীতা সেনগুপ্ত, এঁর স্বামীও একজন আইএএস অফিসার। অনীতা বেশ ভালো গান করেন, বাংলা-হিন্দি দু'রকমই, সেদিনের অনুষ্ঠানে তিনি একজন গায়িকা।

বীরেশ্বরের পদত্যাগের খবর এখনও অনেকে জানে না। জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে আইএএস-দের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল, সেইজন্যই অনীতা বেশ উচ্ছ্বসিত।

প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির অনুষ্ঠানে বেশ আগে আগে যেতে হবে, ইচ্ছে করলে অনীতা বসুধাকে তুলেও নিয়ে যেতে পারেন। কোন শাড়িটা পরবেন সেদিন?

আরও ফোন আসতে লাগল অনেকের কাছ থেকে। চতুর্দিকে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে বোঝা যায়। দিল্লির সবাই তো দেখা যাচ্ছে এমার্জেন্সির জন্য বেশ খুশি, অন্তত অফিসার মহলে।

রাত্তিরে ফোন করলেন স্বয়ং চিফ সেক্রেটারি। রিসিভার তুলেছেন বসুধা, তাই দু'-একটা ভদ্রতার কথার পর বললেন, আপনি ধরুন, আমি মি. দত্তকে দিচ্ছি।

চিফ সেক্রেটারি বাঙালি নন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরেজি বলেন। তিনি বললেন, ম্যাডাম, আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই। আপনি শুনেছেন, আপনার স্বামী কি পাগলামি করছেন?

বসুধা বললেন, শুনেছি অবশ্যই। তবে পাগলামিটা কী, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

তিনি বললেন, এই সময়ে এরকম কাণ্ড কেউ করে? হাওয়া খুব গরম। ওঁর যদি এই ঘোষণায় আপত্তি থাকে, তা হলে কিছুদিন চুপচাপ থাকলেই তো হয়। দু'-তিন মাসের ছুটি নিতে পারেন।

BanglaBook.org

চিঠিটা আমি এখনও ধরে রেখেছি, এখনও উইথড্র করা যায়, আপনি ওঁকে বুঝিয়ে বলুন।

বসুধা বললেন, ওঁর অফিসের ব্যাপারে আমি কখনও মতামত দিইনি!

তিনি খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, এটা শুধু অফিসের ব্যাপার নয়। এটা জীবনের ব্যাপার।

এবারে বীরেশ্বর নিজেই স্ত্রীর হাত থেকে রিসিভারটি নিয়ে বললেন, স্যার, আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন মনে হচ্ছে! আপনার প্রেশার খুব হাই।

চিফ সেক্রেটারি বললেন, বাজে কথা বোলো না দত্ত! তুমি যা করতে চলেছ তার কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে জানো? এখন অনেকেই নানারকম কেরদানি দেখাবে। তোমাকে যারা পছন্দ করে না, তোমার এই হোলিয়ার দ্যান দাউ অ্যাটিটিউড অনেকের অসহ্য বোধ হতে পারে, তারা তোমাকে কোনও ছুতোয় অ্যারেস্ট করিয়েও দিতে পারে।

বীরেশ্বর বললেন, তাই নাকি? এত দূর? স্যার, আমার কাকা কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, পরাধীন আমলে জেল খেটেছেন, এখন আমি স্বাধীন ভারতে সেই কংগ্রেসি আমলেই জেল খাটব। মন্দ কী?

বেশ কিছুক্ষণ ফোনে কথা হল, কিন্তু বীরেশ্বর একবারে শান্ত, একবারও গলা চড়ালেন না। তিনি জেদি মানুষ, অপরের কথায় কোনওদিন নিজের মতামত বদলাননি।

দ্বিতীয় পেগ হুইস্কি শেষ করার পর তিনি বসুধাকে বললেন, আর একটা নেব নাকি? কিংবা তুমি খাবার দিতে বলবে।

বসুধা বললেন, নিতে পারো। কাল তো অফিস নেই।

BanglaBook.org

তারপর অনেকটা হেসে ফেলে বললেন, বাব্বাঃ! তুমি যা অফিস ভক্ত ছিলে, একদিনও তো ছুটি নিতে চাইতে না। এখন সময় কাটাবে কী করে?

বীরেশ্বর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভাবছি, এখন কিছুদিন সময় নিয়ে লোফালুফি করব। টাইম প্রেজেন্ট অ্যান্ড টাইম পাস্ট, অল প্রেজেন্ট ইন টাইম ফিউচার। ভালোই খেলা হবে।

বসুধা বললেন, আমি একটা কথা বলব? আমাদের তো দিল্লির পাট চুকিয়ে দিতে হচ্ছেই। এদিকে আর আসা হবে কি না ঠিক নেই। চলো, কিছুদিনের জন্য কাছাকাছি জায়গাগুলোতে একটু বেড়িয়ে আসি। অনেক কিছুই তো দেখা হয়নি। চলো, কালই বেরিয়ে পড়ি।

বীরেশ্বর ভুরু কুঁচকে বললেন, কালই! তুমি কি এখান থেকে পালাতে চাইছ নাকি?

যাঃ! পালাবার প্রশ্ন উঠছে কী করে?

মিসেস গাঁধীর বাড়ির ফাংশানে তুমি যেতে চাও না? সেখানে বাঙালি অফিসারের স্ত্রীরা গুজগুজ ফুসফুস করে তোমার স্বামীর নিন্দে করবে। সেই পতিনিন্দা তোমার সহ্য হবে না!

ওসব কথা আমি ভাবিইনি। দিল্লিতে অসহ্য গরম, কিন্তু পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, দেখছি তো কাগজে। হোটেলের বারান্দায় বসে পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘ আর বৃষ্টি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। মনে আছে, মেঘদূতের বপ্রক্রীড়া শব্দটা নিয়ে একদিন আমরা—

সুধা, সত্যি করে বলো তো, চিফ সেক্রেটারি যে আমাকে অ্যারেস্ট করার ভয় দেখালেন, সেজন্য তুমি কি দিল্লি থেকে পালাতে চাইছ?

BanglaBook.org

চিফ সেক্রেটারি কখন বললেন ও কথা? আমি তো শুনিনি!

হ্যাঁ বলেছেন।

তোমাকে অ্যারেস্ট করবে? কেন? তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ বলে? হতেই পারে না। দেশটা কি রাতারাতি মগের মুল্লুক হয়ে গেল নাকি?

প্রায় তাই। মিসেস গাঁধী যে স্টেট অফ এমার্জেন্সি ঘোষণা করলেন, আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল থ্রি ফিফটি টু অনুযায়ী তাতে প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে বাক্‌স্বাধীনতার ওপর, মানে খবরের কাগজের ওপরেও সেন্সরশিপ জারি হবে, এডিটোরিয়াল আর পলিটিক্যাল খবর প্রত্যেক দিন ছাপার আগে হোম ডিপার্টমেন্টের ব্যুরোক্র্যাটদের দেখিয়ে আনতে হবে, প্রধানমন্ত্রীর কোনওরকম নিন্দে, এমনকী সমালোচনা করা চলবে না।

এও কখনও সম্ভব? আমাদের দেশে? সমালোচনা করাও চলবে না?

বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো? এ দেশে তো আগে কখনও হয়নি! স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফ্রিডম অফ স্পিচ পেয়েছিলাম। খেতে পাই বা না পাই, চেঁচাতে পারতাম!

দরজায় বেল। বসুধাই দরজা খুলে দিলেন।

অরভিন্দ্‌ গোয়াড়িকর আর মৃগনয়নী। এই মহারাষ্ট্রীয় দম্পতি এঁদের পারিবারিক বন্ধু। অরভিন্দ্‌ আরবান ডেভেলপমেন্টের সেক্রেটারি আর মৃগনয়নীও এডুকেশন সেল-এর একজন অফিসার।

কিন্তু যতই বন্ধুত্ব থাক, এই রাজধানীর সমাজে তো কেউ কারওর বাড়িতে বিনা আমন্ত্রণে অথবা খবর না দিয়ে আসে না।

BanglaBook.org

ভেতরে এসে অরভিন্দ্ কোনওরকম ভণিতা না করেই ইংরেজিতে বললেন, দত্তা, তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? এই সময় কেউ রেজিগনেশন দেয়? দেশে একটা ঘোর পরিবর্তন হতে চলেছে। এই সময় আমরা—

বীরেশ্বর বললেন, অরভিন্দ্, তোমার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার ডিপার্টমেন্টের প্র্যাক্টিকালি কোনও সম্পর্কই নেই। তুমি খবর পেলে কী করে?

অরভিন্দ্ বললেন, খবর বাতাসে ছড়ায়। আমাদের সার্ভিসে সবাই জেনে গেছে। শোনো, আমি বন্ধু হিসেবে তোমাকে বলছি...

বীরেশ্বর হাত তুলে বললেন, ওসব কথা বাদ দাও! তুমি একটু স্কচ খাবে? আমি আর একটা পেগ নেব নেব ভাবছিলাম, তুমি নিলে আমিও নিতে পারি!

অরভিন্দ্ রীতিমতো রেগে গিয়ে বললেন, কথা ঘুরিয়ো না। আমি যে টিটোটালার তাও বুঝি ভুলে গেছ? রাত আটটার পর আমি কোনও ফুড কিংবা কোল্ড ড্রিঙ্কসও টাচ করি না। তোমরা বাঙালিরা কী করে রাত এগারোটায় ভাত-মাছ খাও?

মৃগনয়নী বসুধাকে বললেন, তোমরা দিল্লি ছেড়ে চলে যেতে চাইছ? তোমার স্বামীকে আটকাও। ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবস্থা আরও খারাপ।

বন্ধু দম্পতি যতই রাজধানীর রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলতে চান, ততই বীরেশ্বর কথা ঘুরিয়ে নেন লঘু দিকে।

কিছুক্ষণ পর অরভিন্দ্ বললেন, দত্তা, তুমি যদি আমাকে বন্ধু মনে করো, তা হলে একটা কথা সত্যি করে বলো তো? তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেক

BanglaBook.org

আলোচনা হয়েছে। সকলেরই অভিমত এরকম একটা ক্রিটিকাল সময়ে তোমায় এরকম হঠকারিতা করা ঠিক নয়। তুমি কী বোঝাতে চাইছ? তোমার মতন আমরাও অনেকে রেজিগনেশন দিলে সরকারি নীতির কিছু পরিবর্তন হবে?

আরে না, না, আমি সেরকম কিছুই বোঝাতে চাইছি না। আমি সরকারের একজন সামান্য আমলা। আমার মতামতে সরকারি নীতির কিছুই আসে যায় না। তবে, কোনও সরকারি নীতিতে যদি আমার ঘোর আপত্তি থাকে, সেটা মেনে চলতে আমার বিবেক যদি সায় না দেয়, তা হলেও আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারব না? এটা তো আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা, যা এখনও পর্যন্ত বজায় আছে, তাই না?

কিন্তু ঠিক এই সময়ে তোমার পদত্যাগ করা মানেই কি প্রধানমন্ত্রীর নীতির প্রকাশ্য প্রতিবাদ নয়?

প্রকাশ্য কেন হবে? আমি তো বাইরে কিছু জানাইনি।

তুমি হোম ডিপার্টমেন্টে আছ...খবরের কাগজওয়ালারা ছাড়বে না। তোমার ওপর দায়িত্ব এসে পড়তে পারে।

না, না, অরভিন্দ্, আমি খবরের কাগজের নিউজ হওয়ার যোগ্য নই।

কথা বলতে বলতে অরভিন্দ্ ঘড়ি দেখছিলেন। ঠিক দশটার সময় তাঁরা উঠে পড়লেন। সাড়ে দশটার পর আর তাঁরা বিছানার বাইরে থাকেন না।

দরজা বন্ধ করার পর বীরেশ্বর বললেন, সুধা, এখন কি আমার দিল্লি ছেড়ে যাওয়া উচিত? মনে হচ্ছে, নানারকম খেলা জমবে। জয়প্রকাশ নারায়ণকে জেলে ভরলে সারা দেশে কী যে হবে, দিল্লিতেও বামপন্থীরা...

BanglaBook.org

বসুধা বললেন, রাখো তো ওসব। ক'দিন ধরেই দেখছি, তুমি ভালো করে ঘুমোতেই পারছ না, ছটফট ছটফট করছ। মাথা থেকে এসব তাড়াও এবার। চাকরি যখন ছেড়েই দিয়েছ, 'তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার...'।

বীরেশ্বর বললেন, রবীন্দ্রনাথের ওই গানে ভীরু শব্দটা আছে। আমি কি ভীরু? ভয় পেয়ে পালাচ্ছি?

বসুধা বললেন, না, তুমি যাচ্ছ তোমার বউকে খুশি করার জন্য। পাহাড়ে বসে তুমি আমায় মেঘদূত পড়ে শোনাবে।

আট

দৃশ্য সুন্দর, কিন্তু এই ভ্রমণে পথযাত্রা বেশ ক্লান্তিকর। পাহাড়ের পর পাহাড়। এখানে গাড়ি ঘনঘন বাঁক নেয়। তাতে ঠিক সুস্থির থাকা যায় না।

বীরেশ্বর একটা কালিদাস গ্রন্থাবলি সঙ্গে এনেছিলেন, কিন্তু প্রায় সারাটা পথ ঘুমিয়েই কাটালেন। পরপর ক'রাত তাঁর ভালো করে ঘুম হয়নি। তাই বসুধা পারতপক্ষে জাগালেন না তাঁকে।

সঙ্গে তিনি একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। দিল্লিতে অনেক গাড়োয়ালি মেয়ে বাড়ি বাড়ি কাজ করে। এ মেয়েটির নাম লাখপতা। প্রথমে এ নামের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারেননি বসুধা। মেয়েটিও তার নামের মানে জানে না। বীরেশ্বরই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে লাখপতা হচ্ছে লাখপতির স্ত্রীলিঙ্গ!

বেশ আঁটসাঁট চেহারা, সপ্রতিভ মেয়েটি, খুব হাসিখুশি। সঙ্গিনী হিসেবে বসুধার খুব পছন্দ তাকে। সে এক বর্ণ বাংলা

BanglaBook.org

জানে না, তার দুর্বোধ্য হিন্দিও বসুধা প্রায় কিছুই বোঝেন না, তবু সব কাজের ব্যাপারই ঠিকঠাক সম্পন্ন হয়ে যায়।

প্রায় আট ঘণ্টা পর পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছোনো গেল একটা উপত্যকায়। এখানকার শহরটির নাম মাণ্ডি। এখানকার একটি হোটেলে রাত্রিবাস করে পরদিন কুলু ছাড়িয়ে মানালি।

হোটেল নয়, একটা বড় কোম্পানির গেস্ট হাউজ। চেনাশুনো সূত্রে সহজেই পাওয়া গেছে। টিলার ওপর বাগানঘেরা বাড়িটিই রীতিমতন দর্শনীয়। দোতলায় দুটি ঘর সংলগ্ন বিশাল গোল বারান্দায় বসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

বীরেশ্বর বললেন, আঃ, এখানে এসে টাটকা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। দিল্লিতে যা পলিউশন! কতরকম পলিউশন।

বিকেলবেলা বারান্দায় বেতের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সব সাজিয়ে বসে বসুধা জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বিয়ের পর কোথায় হনিমুনে গিয়েছিলাম তোমার মনে আছে?

বীরেশ্বর বললেন, বাঃ, মনে থাকবে না কেন! আমার তখন পোস্টিং-এর কী একটা গোলমাল চলছিল, তাই তাড়াহুড়ো করে কাছাকাছি কোথায় যেন গেলাম? বেতলা ফরেস্টে, তাই না? বাংলোটায় সেরকম কিছু আরামের ব্যবস্থা ছিল না, কোনও ঘরেই এসি ছিল না, তুমি বড়লোকের মেয়ে, তোমার কষ্ট হয়েছিল জানি।

বসুধা বললেন, তুমি আমাকে বড়লোকের মেয়ে বলে খোঁটা দিয়ো না তো! মোটেই আমার সেখানে কোনও কষ্ট হয়নি। বাংলোটা ছিল অতি চমৎকার, সামনে হরিণ ঘুরে বেড়াত।

BanglaBook.org

একদিন অনেকগুলো বুনো কুকুর এসেছিল না? দারুণ হিংস্র।

এই আমাদের দ্বিতীয় হনিমুন। কোনও দায়-দায়িত্ব নেই, ঝক্কি-ঝামেলা নেই, শুধু আমরা দু'জন। তবে, একটা ব্যাপারে মনটা একটু খচখচ করছে, ছেলেমেয়ে দুটিকে সঙ্গে আনতে পারলে ভালো হত। আমাদের তো একসঙ্গে কোথাও যাওয়াই হয় না।

ওদের একটা বছর পড়াশুনো নষ্ট হয়েছে। এখন তো আর জোর করাই যায় না।

ছেলেমেয়েদের তেমন করে কাছেই পেলাম না। ওরা দূরে দূরে রয়ে গেল।

সুধা, ছেলেমেয়েরা একটু বড় হয়ে গেলে আর ওদের কাছে জড়িয়ে রাখা যায় না। সেটা ওদের পক্ষেই ক্ষতিকর। ওরা এখন অ্যাডাল্ট, ওদের এখন কেরিয়ার তৈরি করার সময়।

মোটেই ওরা এখনও অ্যাডাল্ট হয়নি। তুমি তো খবরই রাখো না। রণের এবার ষোলো হল, আর জুলির তো মোটে তেরো।

হঠাৎ হেসে উঠে বীরেশ্বর বললেন, দ্বিতীয় হনিমুনের দোষ কী জানো, ছেলেমেয়েদের কথাই বেশি মনে আসে! তাই না?

এখানে পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘ ঘোরাফেরা করতে করতে অনেকটা নীচে নেমে আসে। বাড়ির মধ্যেও ঢুকে পড়তে চায়। মানুষের গায়ের ওপর দিয়ে যখন চলে যায়, তখন তাদের স্পর্শ টেরই পাওয়া যায় না। বিশ্বাসই করা যায় না যে এই মেঘই বজ্রগর্ভ হয়, দারুণ শব্দে বাজ পড়ে, সারা আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকায়।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বীরেশ্বর বললেন, তুমি বপ্রক্রীড়া বলছিলে? পুরো লাইনটা হচ্ছে বপ্রক্রীড়া-পরিণত-গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ, অর্থাৎ এক প্রমত্ত হস্তী যেন তার শৃঙ্গের

BanglaBook.org

আঘাতে আঘাতে, মানে গজদন্তের, মত্ত হয়ে উঠেছে। দেখো, কোথাও কোথাও মেঘকে হাতির মতনই দেখায়। আবার মেঘ যে ঘনঘন রূপ পরিবর্তন করতে পারে, সে কথাও কালিদাস একটু পরে উল্লেখ করেছেন।

একটু পরে চা-পান শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বীরেশ্বর বললেন, এই যে মেঘদূতের নায়ক, তার নাম নেই। কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল এক পাহাড়ে। ঠিক আমারই মতন।

সচকিত হয়ে বসুধা বললেন, তার মানে? তোমাকে কে নির্বাসন দিয়েছে? কর্তব্যেই বা তুমি কী অবহেলা করেছ?

বীরেশ্বর গম্ভীরভাবে বললেন, যারা ছিদ্রান্বেষী, তারা ঠিকই কিছু না-কিছু খুঁজে বার করতে পারবে। এখন এইসবই চলবে।

তারপরই আবার হালকা হয়ে গিয়ে বললেন, ওই লোকটির সঙ্গে আমার তফাত এই যে, মাত্র এক বছরেই ও প্রেমিকার বিরহে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল, আর আমার সঙ্গেই তুমি আছ। আমায় বিরহ যাতনা সইতে হবে না, তাই আমাদের নিয়ে কোনও কাব্যও লেখা হবে না।

সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললেন, হারামজাদা!

দুটোই অস্বাভাবিক। সামনেই অ্যাশট্রে। বীরেশ্বর কক্ষনও বাইরে সিগারেটের বাট ফেলেন না। আর তিনি হারামজাদা বললেন কাকে?

এর পরেই তিনি আবার বললেন, ওই যে লোকটা ঝাউগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ার ভান করছে, কাল থেকে দেখছি, আমার ওপর ও লক্ষ রাখছে।

BanglaBook.org

বসুধা বললেন, কোন লোকটা?

উঠে গিয়ে ভালো করে দেখে তিনি বললেন, ও তো পাশের গেস্ট হাউজের কেয়ারটেকার।

বীরেশ্বর বললেন, মোটেই না। আমি জানি, ওকে দিল্লি থেকে পাঠানো হয়েছে।

তারপর তিনি হুংকার দিয়ে ডাকলেন, লাখপতা, লাখপতা, ইধার আও। উ আদমি কো ইধার বোলাকে লাও। যাও, তুরন্ত!

লাখপতা বনহরিণীর মতন ছুটে গিয়ে লোকটিকে নিয়ে এল দোতলায়। সে সত্যিই পাশের গেস্ট হাউজের কেয়ারটেকার।

কিন্তু বীরেশ্বর সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, সে এর মধ্যে সরে পড়েছে। আমি স্পষ্ট দেখেছি, তার গোঁফ নেই।

এই থেকে রোগের শুরু।

এরপর বীরেশ্বর যেখানে সেখানে পুলিশের স্পাই দেখতে লাগলেন। বিশেষত ছাতা মাথায় কোনও মানুষ কাছাকাছি দেখলেই তিনি খেপে যাচ্ছেন। এখানে প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে, অনেক লোকই ছাতা মাথায় দিয়ে যায়।

যুক্তির কোনও প্রশ্ন নেই। সেটাই তো এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

বাইরে বেরুনোই তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। তিনি যে ঠিক ভয় পাচ্ছেন তা নয়, মাঝে মাঝে বলেন, ওরা আসছে না কেন? আমাকে গ্রেফতার করতে চায় করুক। শুধু আমার চারপাশে ঘুরঘুর করবে?

একদিন সিঁড়িতে ছাতা মাথায় একটি ফিরিওয়ালাকে দেখে

BanglaBook.org

বীরেশ্বর হঠাৎ তার ঘাড় চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলেন, শুয়ারকা বাচ্চা, আমি তোকে ভয় পাই?

বীরেশ্বর দত্ত অত্যন্ত সুসভ্য ও ভদ্র, কোনওদিন কারওর গায়ে হাত তোলেননি, কোনওদিন কোনও গালাগাল উচ্চারণ করেননি।

তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটতে লাগল দ্রুত।

দ্বিতীয় হনিমুন মাথায় উঠে গেল বসুধার। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীরেশ্বরকে দিল্লিতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার।

কিন্তু প্রথমবার বীরেশ্বরকে এই প্রস্তাবটি দিতেই তিনি বিস্মিতভাবে বললেন, ফিরে যাব কেন, এত তাড়াতাড়ি? দেখোই না, ওদের খেলাটা কীরকম চলে! ছিপ ফেলে মাছ ধরা দেখেছ, সেইরকম। কিংবা, তুমি কি চাও, আমি নিজে থেকে ধরা দিই দিল্লিতে গিয়ে? ম্যাডামের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলব, হে মহারানি, আপনি আমাকে যা শাস্তি দিতে হয় দিন!

বসুধা বললেন, বীরু, তুমি কী অন্যায় করেছ? কোনও অন্যায় করোনি। সবাই জানে, তুমি খুব অনেস্ট আর স্ট্রেট ফরোয়ার্ড অফিসার। আর পুলিশ তোমায় মোটেই খুঁজছে না। তুমি যাদের স্পাই ভাবছ, তারা কেউ স্পাই নয়। সাধারণ মানুষ।

চোখ দুটো কুঁচকে একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে বীরেশ্বর বললেন, পুলিশের ট্যাকটিক্স আমি জানি না? স্পাইরা সাধারণ মানুষ সাজবে না তো কি যাত্রাদলের হিরো সাজবে?

বসুধা ব্যাকুলভাবে বললেন, কিন্তু কেন, কেন, কেন?

বীরেশ্বর বললেন, সরকারি সার্ভিসে স্ট্রেট ফরোয়ার্ড হওয়াও

BanglaBook.org

তো অপরাধ। চিফ সেক্রেটারি নিজে বলেছেন, আমাকে অ্যারেস্ট করা হবে।

খুব অসহায় বোধ করতে লাগলেন বসুধা।

মানালিতে ডাক্তার আছে, মিশনারিদের একটা ছোট হাসপাতালও আছে। কিন্তু বীরেশ্বরকে তো ডাক্তার দেখাবারও উপায় নেই। আপাতভাবে তো তিনি সুস্থ। এবং বীরেশ্বর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, তার ওপর জোর করাও যাবে না। বসুধা একবার ক্ষীণভাবে ডাক্তারের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি ভুরু কুঁচকে ধমকের সুরে বলেছেন, ডাক্তার? এখানকার সব ডাক্তারদের বারণ করে দেওয়া হয়েছে। তুমি কল দিলে যদি কেউ আসে, তা হলে বুঝবে, সে একটা ছুঁচো। খবরদার, ওদের ভেতরে ঢুকিয়ো না।

বীরেশ্বরের মন ফেরাবার জন্য এক সন্ধেবেলা বসুধা বললেন, তুমি আমায় একটু শেক্সপিয়ার থেকে পড়ে শোনাবে? অনেক লেখাই তো তোমার মুখস্থ! যদি একটু হ্যামলেট শোনাও?

বীরেশ্বর বললেন, শেক্সপিয়ার; সবই তো হিংসে, ষড়যন্ত্র আর খুনোখুনির কাহিনি। ওসব আর আমার ভালো লাগে না!

বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বসুধা পড়তে লাগলেন:

> To be, or not to be, that is the question
> Whether 't is noble in the mind, to suffer
> the stings and arrows of outrageous fortune...

তাকে থামিয়ে দিয়ে বীরেশ্বর বলতে লাগলেন:

> Or to take arms against a sea of troubles,
> And by opposing and them?

সুধা, তোমার কী মনে হয়, ওই হ্যামলেটটা পাগল না? একটা উল্লুক! আচ্ছা, আমাকে যতদিন জেলে ভরে রাখবে, ততদিন কি বইপত্র কিছু দেবে? নাকি সলিটারি সেলে।

বসুধা বললেন, তোমাকে কেউ জেলে রাখবে না...

বীরেশ্বর বললেন, তা হলে কি ধরে নিয়ে গিয়েই ফাঁসি দেবে? হা হা হা।

বসুধা বুঝতে পারলেন, তিনি একা আর সামলাতে পারবেন না। তাঁর সাহায্যের দরকার। একমাত্র লাখপতাই ভরসা।

বীরেশ্বরের দিকে নিকট আত্মীয় কেউ নেই, শরিক বা জ্ঞাতি যারা আছে, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ ক্ষীণ। বসুধার বাপের বাড়িতে আছে প্রচুর আত্মীয়স্বজন, তাঁরা ভাইবোনই তো ছ'জন। ছোট ভাই সত্রাজিৎ আছে চণ্ডীগড়ে, পেশায় সে স্থপতি।

টেলিফোন পেয়ে সত্রাজিৎ চলে এল দেড় দিনের মধ্যে। বীরেশ্বরকে প্রণাম করে যখন সে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন বীরেশ্বরদা? তার উত্তরে বীরেশ্বর ঠান্ডা গলায় বললেন, তুমি ঠিক কে বলো তো?

সেই থেকে বীরেশ্বরের লোক চিনতে ভুল হওয়ার শুরু।

সত্রাজিৎ আমুদে স্বভাবের মানুষ। বসুধা নিশ্চয়ই আগে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন, তাই সত্রাজিৎ বীরেশ্বরের ওই ব্যবহারে বিশেষ অবাক হল না। উৎফুল্ল মুখে সে বলল, আমায় চিনতে পারছেন না নাকি? আপনার অনেকগুলো শালা, তার মধ্যে ছোট শালাটার সঙ্গেই তো আপনার মাখামাখি ছিল বেশি। অনেকদিন দেখা হয়নি, তাই না? নিন, সিগারেট নিন। আপনার জন্য একটা ভালো স্কচ এনেছি। প্রিমিয়াম।

গত কয়েকদিন এই গেস্ট হাউজে যেন শৈত্যপ্রবাহ বইছিল,

BanglaBook.org

সত্রাজিৎ এসে সবকিছু চাঙ্গা করে দিল। সে জোরে কথা বলে, হা-হা করে হাসে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সে বেশি উৎসাহী।

বীরেশ্বর তাকে মেনে নিলেন, গলা মিলিয়ে হাসলেনও কয়েকবার। কিন্তু তাঁর স্পাই-বাতিক একটুও কমল না। বারান্দায় বসে বসে বিভিন্ন লোকের দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, ওই যে লোকটা, ও তিন দিন ধরে ঘুরে ঘুরে আসছে, নোট নিচ্ছে। আর ওই যে, ছাতার আড়ালে মুখ আড়াল করে চলে গেল, ও একটা ভাড়াটে খুনি, জানি! জানি! সিঁড়ির গেট বন্ধ আছে তো?

এসব দেখে সত্রাজিৎ কোনও মন্তব্য করল না।

সন্ধেবেলা স্কচের বোতল খোলার পর একটু বাদে সত্রাজিৎ বলল, বড় জামাইবাবু আপনি এত স্বার্থপর হয়ে গেলেন কবে থেকে?

বীরেশ্বর খানিক হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, তার মানে? আমি স্বার্থপর, মানে, তার কী দেখলে তুমি?

সত্রাজিৎ বলল, দেশে এমার্জেন্সি জারি হয়েছে। আপনি রেজিগনেশন দিয়েছেন। বেশ করেছেন। সাহসের কাজ করেছেন। আমিও এই এমার্জেন্সির টোটাল বিরুদ্ধে। আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ। কিন্তু তারপর কী সব ছেলেমানুষি শুরু করেছেন? সব সময় নাকি স্পাইরা আপনার ওপর নজর রাখছে। আপনাকে এতটা গুরুত্ব দিতে সরকারের বয়েই গেছে। আরে দাদা, আপনাকে অ্যারেস্ট করতে চাইলে দিল্লি থেকে বেরোতেই দিত না। এর মধ্যেই অনেক ধড়পাকড় শুরু হয়ে গেছে। এখানে আপনি যা দেখছেন, সবই আপনার মনের ভুল।

ছোট শ্যালকটির দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে কড়া গলায়

BanglaBook.org

বীরেশ্বর বললেন, মনের ভুল? আমি আমার মনকে চিনি না? কাল যে রাত্তিরে আমার ঘরের জানলা দিয়ে একজন মুখোশ পরা লোক ঢোকার চেষ্টা করছিল, সেটাও আমার মনের ভুল? আমি তাকে বললাম, কাম অন ইন, ইউ আর ওয়েলকাম! ইউ বাস্টার্ড! অমনি সে আবার জানলা টপকে পালিয়ে গেল।

সত্রাজিৎ বলল, আপনি ইংরেজি বললেন বলেই সেই ভিলেনটি পালিয়ে গেল, আপনি সেই আনন্দেই থাকুন। এখানকার মুখোশধারী ভিলেনরা এলে যে-কাজের জন্য আসে, তা না সেরে যায় না। আপনি এই খেলা নিয়ে মত্ত আছেন বলে আমার দিদি যে কত অসুস্থ, তার খবরও রাখেন না।

বীরেশ্বর এবার সচকিত হয়ে বললেন, সুধা অসুস্থ? কী হয়েছে তার?

সত্রাজিৎ বলল, আপনি তো তার দিকে তাকিয়েও দেখেন না। মুখটা কীরকম ফুলো ফুলো হয়ে গেছে, প্রেশার খুব বেশি। আর এর মধ্যে একদিন ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে।

বীরেশ্বর চেঁচিয়ে ডাকলেন, সুধা, সুধা! কোথায় গেলে!

সত্রাজিৎ পুরোপুরি মিথ্যে বলেনি। কয়েক বছর ধরেই বসুধার প্রেশার বেশি, সেজন্য ওষুধও খেতে হয়। আর মুখ দিয়ে নয়, নাক দিয়ে তাঁর রক্ত পড়ে মাঝে মাঝে, সেই ছেলেবেলা থেকেই। ডাক্তাররা চেষ্টা করেও এটা সারাতে পারেননি। তবে মুখ দিয়ে রক্তপাত যতটা আশঙ্কার, নাকের রক্ত তেমন কিছু নয়।

বীরেশ্বর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, তোমার শরীর খারাপ, আমাকে বলোনি?

বসুধা সহাস্য মুখে বললেন, কোথায় শরীর খারাপ, আমার কিছু হয়নি। এই জিতুটা বেশি বেশি বাড়িয়ে বলে।

BanglaBook.org

বীরেশ্বর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না, না, প্রেশার বাড়াটা মোটেই নেগলেক্ট করা উচিত নয়। ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করো।

সত্রাজিৎ বলল, আপনিই নাকি বলেছেন, এখানকার ডাক্তাররা... আমার তো মনে হয় আপনাদের এখন দিল্লিতে ফিরে যাওয়া উচিত। দু'জনেরই ভালো করে চিকিৎসা করানো দরকার।

বীরেশ্বর আবার ফোঁস করে উঠে বললেন, দু'জনের মানে? আমার কী হয়েছে? কিচ্ছু হয়নি!

সত্রাজিৎ বলল, হ্যাঁ, হয়েছে। আপনি যে মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখছেন, মানুষকে সন্দেহ করছেন, সেটাও তো একটা অসুখ। এরও চিকিৎসা আছে।

বীরেশ্বর বাঁকা সুরে বললেন, তুমি আজকাল বড্ড বেশি বুঝতে শিখেছ, তাই না? তুমি, তুমি একটা...

সত্রাজিৎ বললেন, আমার ওপর রাগ করছেন কেন, জামাইবাবু? আমার যা সত্যি মনে হয়, তাই বলি। আপনি আমাকে যতই বকুনি দিন, আমি কিচ্ছু মনে করব না! তা হলে দিল্লি ফিরবেন? আমি গাড়ির ব্যবস্থা করব?

বসুধা বললেন, তুমি যদি চাও, আমরা দিল্লিতে না থেকে, একদিন পরে কলকাতাতেও ফিরে যেতে পারি।

বীরেশ্বর আর আপত্তি করলেন না।

গাড়িতে যেতে যেতে তাঁর আর একটি নতুন উপসর্গ দেখা দিল। বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলা। পাশে বসেও তার কিছুই মর্ম উদ্ধার করা যায় না।

কলকাতার ফ্ল্যাটটা দক্ষিণ কলকাতার আয়রন সাইড রোডে। কলকাতায় তখন সবেমাত্র বহুতল বাড়ি তৈরি হতে শুরু হয়েছে।

BanglaBook.org

এই বাড়িটি একেবারে প্রথম দিকের অন্যতম। সাততলার ওপরের ফ্ল্যাটটির একটি বিশেষ সুবিধে, ওপর থেকে রাস্তার লোক চলাচল বিশেষ দেখা যায় না। আগে অবশ্য এই সুবিধের কথা মনে আসেনি বসুধার।

কলকাতায় এসে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন বসুধা, এখানে অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য পাওয়া যাবে।

বীরেশ্বরের যা রোগ, তা সাধারণত আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এটা বেশ দ্রুত ছড়াতে লাগল। নিজেদের পরিচিত ফ্ল্যাট, অনেকবার এসে থেকেছেন, অথচ এখন বাথরুমের দরজা খুঁজে পান না, আলোর সুইচ চেনেন না। প্রথম দিনেই একটা জানলা নিজে খুলতে গিয়ে কাচ ভেঙে ফেললেন।

বসুধা ঠিক করেছিলেন, স্বামীকে খবরের কাগজ পড়তে দেবেন না, কিন্তু আটকাবেন কী করে? বীরেশ্বর নিজেই কাজের লোককে দিয়ে ইংরেজি-বাংলা দুটো সংবাদপত্র আনালেন।

জরুরি অবস্থা জারির পর সত্যি সত্যি বেশ গ্রেফতার শুরু হয়ে গেছে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা জুড়ে সেইসব কথাই বেশি।

বীরেশ্বর হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন, সুধা, সুধা, দেখো, আমি বলেছিলাম না? গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরবে, সব জেলখানা ভরে যাবে।

বসুধা আস্তে আস্তে বললেন, তাতে তোমার এত ভয় পাওয়ার কী আছে? না হয় জেলেই থাকবে কিছুদিন। তার বেশি কিছু তো নয়। আমরা ঠিক মানিয়ে নেব।

বীরেশ্বর বললেন, ভয়? জেলখানার ভয়? মোটেই না। আমি তো অনেক সিক্রেট জানি, ইনক্লুডিং সেক্সলাইফ অফ মিসেস গাঁধী, বুঝলে? তাই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা টর্চার করবে

BanglaBook.org

ইলেকট্রিক শক দেবে। আমার স্কালটা খুলে ব্রেনটা বার করে নেবে। এইভাবে আমার ঘিলু চটকাবে!

বসুধা দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বললেন, প্লিজ, প্লিজ, থামো, থামো! আমার কাকা নামকরা ল-ইয়ার, তাঁকে খবর দিয়ে রাখব।

বীরেশ্বর বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন, ওসব ল-ইয়ার ফ-ইয়ার দিয়ে কিস্যু হবে না। তা ছাড়া তোমার কাকাও যে এতদিনে স্পাই হয়ে যায়নি, তা তুমি কী করে জানলে?

এর মধ্যে দু'জন নামকরা ডাক্তারকেও বাড়িতে ডেকে এনে দেখানো হল। দু'জনেরই অভিমত, কিছুদিন নার্সিংহোমে রাখতে পারলে চিকিৎসার সুবিধে হয়।

কিন্তু বীরেশ্বর কিছুতেই নার্সিংহোমে যাবেন না। সেরকম প্রস্তাব শোনামাত্র তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, গেট আউট! গেট আউট! আমাকে পাগল সাজিয়ে পাগলাগারদে ঢোকানোর মতলব? অ্যাঁ? দিস ইজ মাই হোম, দিস ইজ মাই ফোর্ট। আমি এখান থেকেই লড়াই চালাব।

এরকম একজন মানুষকে তো চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই বাড়িতেই যেটুকু সম্ভব চলতে লাগল চিকিৎসা।

ছেলে আর মেয়েকে বাড়িতে আনা হল কয়েকদিনের জন্য। তাদের দেখেও কিছুই তাপ-উত্তাপ হল না বীরেশ্বরের। ঠিক চিনতে পারলেন কি না, তাও বোঝা গেল না। ঠান্ডা গলায় বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো, ভালো, যা খাবি, দেখেশুনে খাবি।

কয়েক মাসের মধ্যেই এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা শুনে, সুস্থ অবস্থায় থাকলে বীরেশ্বর নিশ্চিত খুব উত্তেজিত হয়ে উঠতেন।

পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়

BanglaBook.org

যখন উৎসব চলছে, তার মধ্যেই আগুনের মতন খবর ছড়িয়ে গেল যে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান অতি নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন সপরিবারে, এমনকী তাঁর আট বছরের ছেলে রাসেলও বাদ যায়নি। শুধু তাঁর দুটি মেয়ে, হাসিনা আর রেহানা পড়াশুনো করছে দেশের বাইরে, তাই তারা বেঁচে গেছে।

পাকিস্তানের জেল থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথাও ঘোষণা করলেন। কিন্তু ঠিক সামলাতে পারলেন না। কিছুদিন পর হলেন রাষ্ট্রপতি, দেশে জারি করলেন একদলীয় শাসন। তিনি নিজেই গণতন্ত্রের ওপর কিছুটা শাসন চাপালেন, কিন্তু তাঁর কাছাকাছি কিছু মানুষের অসম্ভব দুর্নীতি ও হঠকারিতা রোধ করতে পারলেন না।

তিনি বঙ্গবন্ধু, তিনি সারা দেশে অসম্ভব জনপ্রিয়, তাঁর মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারওর নেই। তিনিই তো বাংলাদেশের স্রষ্টা। ভোরবেলা সেনাবাহিনী তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলেছে শুনে তিনি হয়তো ভাবলেন, তিনি দু'হাত তুলে ধমক দিলেই সৈনিকেরা তাদের মাথা এবং কামানের নল নিচু করবে। তার বদলে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ল সিঁড়িতে।

বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় বীরেশ্বর অনেকখানি জড়িত ছিলেন, এই দেশটি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আবেগ ছিল। এখন বসুধা তাঁকে ওই মর্মান্তিক সংবাদটি শোনাবার পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, শেখ মুজিবর রহমান, জানতাম, তাঁকে তো সাবধান করেও দেওয়া হয়েছিল...আগুন নিয়ে খেলা, আগুন নিয়ে খেলা।

BanglaBook.org

চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি পায়চারি করতে করতে মৃদু গলায় বললেন, বঙ্গবন্ধু... তাঁর ছোট ছেলেটাকেও মেরে ফেলেছে? কত বছর বয়েস, সাত-আট হবে, তাই না? যে খুনটা করল, তার কি নিজের ছেলেমেয়ে আছে? বাচ্চাদের যারা মারে, বাচ্চাদের যারা মারে, বাচ্চাদের যারা মারে...

এই কথাই বলে যেতে লাগলেন অনবরত।

কলকাতায় আত্মীয়স্বজন অনেকেই আসে মাঝে মাঝে। বাংলাদেশ থেকেও বেড়াতে আসে অনেকে। বসুধা প্রথম প্রথম তাঁদের নিয়ে যেতেন বীরেশ্বরের কাছে। তিনি সারাদিন একটা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে ধূমপান করেন আর কথা বলেন নিজের সঙ্গে। যারা দেখা করতে আসে, তাদের অধিকাংশকেই তিনি চিনতে পারেন না। কিংবা চিনলেও দুটো-একটার বেশি কথা বলেন না।

বসুধার ছোট বোন বেলার সঙ্গে খুব ভাব ছিল বীরেশ্বরের। বেলার খুনসুটি তিনি বেশ পছন্দ করতেন। সেই বেলাকেও তিনি এখন আর পাত্তা দেন না, বেলা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে যখন বলে, ও জামাইবাবু, আসুন না আগের মতন একবার আমরা রুমালচোর খেলাটা খেলি। এই কৌতুকের উত্তরে গোমড়ামুখো বীরেশ্বর বললেন, চোর? দেশে তুমি অনেক চোর পাবে, তাদের সঙ্গে খেলতে যাও না!

একদিন দেখা করতে এলেন বাংলাদেশের গাজি সাহাবুদ্দিন আর তাঁর স্ত্রী বীথি। এই দম্পতিই একদিন ঢাকার রাস্তায় জুলিকে উদ্ধার করে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এঁদের সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে গেছে। এক বছর আগেই বসুধা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় গিয়েছিলেন, তখন এঁরা জোর করে

BanglaBook.org

তাঁদের বাড়িতে বসুধাদের রেখে দিয়েছিলেন এক রাত্রি।

এবারে এই দম্পতির সঙ্গে এসেছে একজন তৃতীয় ব্যক্তি। গাজি সাহাবুদ্দিন বললেন, ভাবী, আমাদের এক তরুণ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসলাম। ও বলেছে, ও আপনাকে চেনে।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একজন যুবক, মুখে শৌখিন দাড়ি, পুরোদস্তুর সুট-টাই পরা, বসুধা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, চিনতে পারলেন না।

সে দু'হাত জোড় করে বলল, বউদি, আমি জহির। কবুতরহাটির ক্যাম্পে ছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম মাঝে মাঝে। আপনি আমাদের অনেক যত্ন করেছেন। আমরা—

বসুধা বললেন, তোমরা তিন বন্ধু।

জহির বলল, জি। আমি, স্বপন আর মনির, আমরা...

বসুধা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সেই ছিপছিপে চেহারা, ময়লা পোশাক পরা, মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা মুক্তিযোদ্ধাকে এই সুসজ্জিত পুরুষটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া সত্যি দুষ্কর।

হঠাৎ বসুধা তাঁর বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলেন।

বীথি বললেন, জহির এখন ব্যাবসা করে। এর মধ্যেই বেশ ভালো করতেছে।

জহির তার হাতের একটি প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বউদি, আপনার জন্য একটা ঢাকাই।

বীথি বললেন, এই তুমি আগে দেবে না। আগে আমারটা।

বীথি প্রত্যেকবারই একটি উৎকৃষ্ট শাড়ি নিয়ে আসেন। বাংলাদেশের মানুষ যেমন খাওয়াতে ভালোবাসে, তেমনি উপহার দেয়। আজ একসঙ্গে দুটি শাড়ি।

BanglaBook.org

বসুধা বললেন, এত ভালো ভালো শাড়ি, আমি আর পরব কখন? বাড়ি থেকে বেরোনোই হয় না।

বীথি বললেন, আপনার মেয়ে পরবে। মেয়ে কত বড় হল?

বসুধা বললেন, বড় হয়েছে, কিন্তু শাড়ি পরতে চায় না।

বসুধা জহিরের দিকে তাকাচ্ছেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে কীসব যেন হচ্ছে। মনে পড়ছে সেই একাত্তর সালের ডিসেম্বরের কথা।

তিনি বললেন, ঢাকায় গিয়ে তোমাদের তিন বন্ধুর অনেক খোঁজ করেছি। কারওরই তো পুরো নাম জানি না। মুক্তিযোদ্ধাদের কমপ্লিট তালিকাও কোথাও পাওয়া যায় না।

জহির বলল, বউদি, আমরা কী চেয়েছিলাম, আর দেশটার কী হাল হল! কী বলব আপনাকে, অনেক মুক্তিযোদ্ধা এখন নিজেদের পরিচয় দিতেও ভয় পায়। রাজাকাররা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শেখসাহেব সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে ভালো করেননি। ওরাই এখন ক্ষমতা দখল করে নিচ্ছে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও...

গাজি বললেন, থাক, থাক, ওসব পলিটিক্স এখন থাক।

জহির বলল, জানেন বীথিভাবী, সেই সময়ে আমাদের জীবনে কত রিস্ক ছিল। তবু যে কী সুন্দর লাগত! মুর্শিদাবাদে এনাদের মস্ত বড় বাড়ি। সারাদিন রিলিফের কাজে সুধাবউদি ব্যস্ত থাকতেন, মস্ত বড় ক্যাম্প, প্রায় বারো হাজার মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা...সন্ধ্যার পর উনি অনেকটা ফ্রি থাকতেন। তখন আমরা যেতাম গল্প করতে, কত আবদার করতাম।

বসুধা এবার খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আর দুই বন্ধু এখন কোথায়?

জহির বলল, আর যোগাযোগ নাই। ইন ফ্যাক্ট, সেই রাত্তিরের

BanglaBook.org

ার আমি আর ওদের দু'জনকে দেখি নাই।

গাজি সাহাবুদ্দিন বললেন, তোমরা মক্তিযুদ্ধে কি সত্যি সত্যি লড়াই করেছ? অস্ত্র হাতে নিয়েছ? এখন তো অনেক ছেলেপিলেকে দেখি, বন্দুক ধরতেই জানে না, পাক আর্মির ধারেকাছেও যায়নি, তবু নিজেদের বীর যোদ্ধা বলে বড়াই করে, স্মৃতিকথাও লিখে ফেলছে।

গাজির এই পরিহাস অগ্রাহ্য করে জহির বলল, সেই যে এক রাত্তিরে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে গেলাম, সেই রাত্তিরেই আমাদের শেষ অ্যাকশন। পাক আর্মি তো তখন অনেকটা পিছু হটে গেছে, শুধু একটা পকেট, চণ্ডীতলা নামে একটা গ্রাম, সেখান থেকে মাঝে মাঝে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সেটা শুধু রাজাকারদের ঘাঁটি, না দুই-চারটা পাক আর্মিও সেখানে রয়ে গেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। আরও শোনা গেল, ওখানে প্রায় সতেরো-আঠারো জন মুক্তিযোদ্ধাকে আটক করে রাখা হয়েছে, অনেক জেরা করার পর তাদের মারা হচ্ছে এক-এক করে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঘাঁটি ভেঙে না দিলে আমাদেরই লোকজন মরবে। সেই রাত্তিরেই আমরা—

তাকে বাধা দিয়ে গাজি জিজ্ঞেস করলেন, এটা ডিসেম্বরের কত তারিখ?

বসুধাই উত্তর দিলেন, চোদ্দোই ডিসেম্বর।

বীথি বললেন, ঠিকই তো, ওই সময় রাজাকাররা কতজনকে যে মেরেছে!

বসুধা তাকালেন জহিরের দিকে। সে আবার বলল, ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল মাত্র সাত মাইল দূরে। সেখানকার কর্নেল সুখবিন্দর সিংহ, নামটা আমার আজও মনে আছে, আমাদের বললেন,

BanglaBook.org

আমরা শেলিং করে ওই ঘাঁটি ধ্বংস করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে গ্রামের অনেক সাধারণ মানুষও মরতে পারে। আর ওদের হাতে যদি তোমাদের মুক্তি বন্ধুরা বন্দি থাকে, তা হলে তাদেরই বা বাঁচাব কী করে? আমি সাজেস্ট করছি, অন্ধকারের মধ্যে তোমরা কয়েকজন যদি দেখে আসতে পারো ওদের স্ট্রেংথ কতটা...। আমাদের গ্রুপ লিডার ছিলেন ওসমানভাই, তিনি বললেন, না কর্নেল, আমাদের বন্ধুদের উদ্ধার করার দায়িত্ব আমাদের। এটা আমরাই পারব। তখন কীরকম স্পিরিট ছিল, তা তো আপনারা ঠিক বুঝবেন না। আমরা প্রত্যেকে ভেবেছিলাম, আমাদের বন্ধুরা যেখানে বন্দি হয়ে আছে, সেখানে আমাদের যেতেই হবে, যেতেই হবে।

কর্নেল তবু বললেন, তোমরা সামনাসামনি ফাইট করতে যেয়ো না। ওদের কাছে কী আর্মস আর অ্যামিউনিশন আছে, তা তো তোমরা জানো না। শুধু ইনফর্মেশন আনতে পারলেই আমরা মার্চ করে এগিয়ে যাব।

সেই অন্ধকারে আমরা মোট কুড়ি জন একসঙ্গে এগোলাম। কিছুটা পায়ে হেঁটে, তারপর সাপের মতো বুকে হেঁটে। আমরা তিন বন্ধু পাশাপাশি। আমরা তখন এমনই উৎসাহে জ্বলছি যে এক মুহূর্তে নিজের জীবনটা ছুড়ে ফেলে দিতে পারি। ওই কর্নেলের কথা আমাদের শোনা উচিত ছিল, আমরা নিজেদের ওভার-এস্টিমেট করেছিলাম। গ্রামটার পাশে যেতেই ওরা ফায়ারিং শুরু করল। তখন আমাদের পিছিয়ে গিয়ে পজিশন নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা রে রে করে দৌড়ে একটা খাল পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম।

গাজি সাহাবুদ্দিন বললেন, এই কাহিনিটা আমি কোন পত্রিকায়

BanglaBook.org

যেন পড়েছি। ওসমানবাহিনী কোন একটা গ্রাম থেকে যেন প্রায় লাস্ট মোমেন্টে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে উদ্ধার করে। ওসমান নিজেই বোধহয় লিখেছে। তুমি ছিলে সেই দলে?

জহির বলল, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমরা সেই ঘাঁটি দখল করতে পেরেছিলাম। কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক বেশি। কিছু প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে আমরাও অনেক প্রাণ দিয়েছি। ওদের ফায়ার পাওয়ার আমাদের অন্তত চারগুণ, সেটা বুঝেও সামনা-সামনি এগিয়ে যাওয়া, মূর্খতা, সুইসাইডাল। যুদ্ধের সময় কখন পিছিয়ে যেতে হয়, তাও মিলিটারি সায়েন্সে শিখতে হয়। আমরা তো ওসবের ধার ধারতাম না। আমাদের ছিল ইমোশন। দেশের জন্য ভালোবাসা। ওসমানভাই যাই-ই লিখে থাকুন, গোলাগুলির শব্দ পেয়েই বোধহয় ইন্ডিয়ার কর্নেল সাহেব এগিয়ে এলেন। শেষ মুহূর্তে তাদের সাপোর্ট না পেলে আমরা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। আমার পিঠে গুলি লেগেছিল। ওরা আমাকে তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে না পাঠালে বোধহয় আমি বাঁচতাম না।

বসুধা জিজ্ঞেস্ করলেন, তোমার আর দুই বন্ধু?

জহির বলল, মুনির আর স্বপন আমার পাশেই ছিল। একসময় ওদের আর দেখতে পাইনি। অন্ধকারের মধ্যে গায়ে গায়ে লেগে থাকা তো সম্ভব নয়। কে কোথায় সরে যায়...ওদের আমি আর কখনও দেখিনি, অনেক চেষ্টা করেও খবর পাইনি। ওরাও আমার...

গাজি বললেন, এতদিনেও যদি খবর না পেয়ে থাকো, তা হলে ধরেই নিতে পারো, আর খবর নেই!

বসুধা উঠে গেলেন ওদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে। তারপর

BanglaBook.org

রান্নাঘরে ঢুকে, কী জন্য এসেছেন তা ভুলে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

কিছুক্ষণ অন্যান্য গল্প করার পর হঠাৎ একসময় জহির নামে এই সুবেশ, সার্থক ব্যাবসায়ীটি বসুধার দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় বলল, এক-এক সময় কী মনে হয় জানেন বউদি? আমার কপালের মাঝখানে একটা পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে নিজেকে শেষ করে দিই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা অনেকে বেঁচে নেই, তা হলে আমি শুধু শুধু বেঁচে আছি কী জন্য?

একুশ মাস বাদে ভারতের জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হল। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদানের আদেশ দিয়ে ইন্দিরা গাঁধী নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন।

কিন্তু এর ফলে বীরেশ্বরের অবস্থার কোনও হেরফের হল না। খবরের কাগজে বড় বড় কাঠের ব্লকে আট কলম হেডিং, সেই কাগজ তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরা হল, তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। দেরি হয়ে গেছে, তাঁর পক্ষে দেরি হয়ে গেছে।

এর মধ্যে বীরেশ্বরের একটা সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডান হাত ও ডান পায়ের সব শক্তি চলে যায়। কথাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবে তা একটু একটু করে ফিরে আসছে। কিন্তু হাঁটার আর ক্ষমতা নেই।

তিনি এখন হুইল চেয়ার বাউন্ড। ফ্ল্যাটের মধ্যেই মাঝে মাঝে তাঁকে এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়া হয়। ছেলেমানুষের মতন স্বভাব হয়ে গেছে, বসুধা না খাইয়ে দিলে তিনি কিছুতেই খাবেন না। অন্য কেউ এলে ছটফট করবেন, সব ফেলে দেবেন। ফলে,

BanglaBook.org

বসুধাকে বাড়িতেই থাকতে হয়। এর মধ্যে জুলি এসে ক'দিন রইল, বাবাকে সেবা-যত্নের অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু বাবা তাকে চিনতেই পারলেন না।

এখন প্রায় কাউকেই চিনতে পারেন না বীরেশ্বর। প্রায় বলার কারণ এই যে আত্মীয়-বন্ধুরা তো সবাই বাদ, কিন্তু কী আশ্চর্য, যে পরামানিকটিকে মাঝে মাঝে ডেকে আনা হয় বীরেশ্বরের চুল-দাড়ি কাটার জন্য, সেই হরিপ্রসাদের নাম মনে রেখেছেন তো বটেই, তার ছেলেমেয়ের কথাও জানেন। তাদের কথা জিজ্ঞেস করেন। আর রেডিয়োতে বিশেষ একটি কণ্ঠস্বর শুনলেই তিনি বলে ওঠেন, দেবদুলাল। দেবদুলাল, তাই না?

স্মৃতির এ রহস্য কে মোচন করবে!

কেটে গেছে বেশ কয়েকটি বছর। এখন কলকাতায় শুরু হয়েছে খুব পাওয়ার কাট, স্থানীয় ভাষায় লোডশেডিং। যুদ্ধের সময় শহর নিষ্প্রদীপ রাখার তবু একটা সময়সীমা থাকে, কিন্তু এই লোডশেডিং একেবারে অরাজক অবস্থার মতন যখন তখন।

এক সন্ধেবেলা বসুধা তাঁর স্বামীকে দুধ আর সিরিয়াল খাওয়াচ্ছেন, এটাই তাঁর প্রিয় খাদ্য, দু'বেলাই খান, এই সময় অন্ধকার হয়ে গেল।

এক পরিচারিকাকে বাতি আনার কথা বলে বসুধা চুপ করে বসে রইলেন।

বীরেশ্বর হাত বাড়িয়ে বসুধার একটা হাত ছুঁয়ে বেশ যেন বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তুমি কে বলো তো?

বসুধা হেসে বললেন, বাঃ, একটু আগেই তো তুমি দেখলে আমি তোমার সামনে বসে আছি। আমি তো উঠে যাইনি।

বীরেশ্বর বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তুমি কে?

BanglaBook.org

এর মধ্যে মালতী একটা মোমবাতি নিয়ে এসেছে। সেটা মুখের সামনে ধরে বসুধা বললেন, এই যে দেখো! আর একটু খাবার দেব?

বীরেশ্বর দু'দিকে প্রবল মাথা নেড়ে বললেন, না। সে কোথায় গেল?

তুমি কার কথা বলছ? আর তো কেউ ছিল না এখানে।

মোমবাতিটা বসুধার কাছ থেকে নিয়ে বীরেশ্বর নিজের হাতে গরম মোমের ফোঁটা ফেলতে লাগলেন।

সেটা কেড়ে নিয়ে বসুধা ধমকের সুরে বললেন, কী হচ্ছে? নাও, আর একটু খেয়ে নাও। প্লিজ!

বীরেশ্বর বললেন, আমার মা বলত, লক্ষ্মীটি খেয়ে নে। এখন বলে প্লিজ, খেয়ে নাও। তুমি কি নার্স?

বসুধা বললেন, কী হচ্ছে এটা? তুমি আমাকেও চিনতে পারছ না নাকি?

বীরেশ্বর বললেন, না। চিনি না। তুমি কে বলো তো? এটা কার বাড়ি? তুমি... তুমি...

এবারে বসুধা বিশাল আর্তনাদ করে বললেন, না, না, তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজি আছি। কিন্তু তুমি যদি আমায় চিনতে না পারো, তা আমি সহ্য করতে পারব না, পারব না। আমি সুধা, সুধা, সুধা...

বীরেশ্বর অস্ফুটভাবে একটা অচেনা শব্দের মতন বলতে লাগলেন, সুধা, সুধা, সুধা...

Banglabook.org

নয়

জুলির কথা

আমার প্রথম ভুল গুনিকে বিয়ে করা। তার মতন এমন ভদ্র, সভ্য, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন মানুষ আর হয় না। কিন্তু স্বামী হিসেবে সে অপদার্থ।

অনেকেই বলত, আমরা দু'জনে ঠিক রাজযোটক, মেড ফর ইচ আদার। প্রকাশ্য জীবনে তাই। কিন্তু যে-কোনও দম্পতির নিভৃত জীবনের কথা ক'জন জানতে বা বুঝতে পারে?

গুনি অত্যন্ত সহৃদয়, আমার প্রতি সে কখনও অযত্ন করেনি। কিন্তু যৌন ব্যবহারে সে অত্যন্ত স্বার্থপর। তার যখন ইচ্ছে হবে, তখন সে আমায় স্পর্শ করবে। আবার রাতের পর রাত সে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। রাত জেগে জেগে সে অঙ্ক কষে. আমি নিজে থেকে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেছি, তখন ও মুখ ফিরিয়ে খুব মিষ্টি করে হেসে বলেছে, ডার্লিং, প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব মি টু ডে। তার হাসিমুখে এই চরম নিষ্ঠুরতা ও অপমান আমি বেশ কিছুদিন সহ্য করেছি।

গুনির আর একটা দোষ, তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার পরিচয় না করিয়ে দেওয়া। সে যে আমায় গৃহবধূ করে রাখতে চেয়েছিল, তাও ঠিক নয়, আমার স্বাধীনতায় সে বাধা দেয়নি। কিন্তু ওদের নিজস্ব সমাজে আমি প্রবেশ অধিকার পাইনি। ভাষার ব্যবধান ছিল, কিন্তু আমি একটু একটু ওদের ভাষা শিখে নিচ্ছিলাম। শুনলে বুঝতে পারি।

একা ছিলাম, বেশ ছিলাম। বিয়েটা হয়েছিল নিতান্তই এক

BanglaBook.org

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে। আমার পক্ষ থেকে কেউ ছিল না। দাদা ততদিন জার্মানি চলে গেছে। মা-বাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাবা অনেকদিন ধরেই অসুস্থ আর মাকেও সেইজন্য বাড়িতেই আটকে থাকতে হয়। আসলে কোনও পারিবারিক টানই আমার মধ্যে জন্মায়নি। হস্টেলে কিংবা অন্য জায়গায় থেকেছি, বাবা-মাও দূরে দূরে। পড়াশুনো যখন শেষ করলাম, ততদিনে বাবা আর মানুষ চিনতে পারেন না। আর মায়ের সঙ্গে আমার সহজ সম্পর্ক হল না কিছুতেই।

আমার দ্বিতীয় সাংঘাতিক ভুল আমেরিকায় যাওয়া। আমেরিকা সকলের সহ্য হয় না। আমেরিকা আমাদের দেশের কিছু কিছু মানুষের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক জায়গা। ও দেশে গিয়েও যারা নিজেদের একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে, তারা বেঁচে যায়, তারা উন্নতি করে। সবাই বলে, আমেরিকা সবরকম সুযোগের দেশ, যার যা গুণ আছে তার সঠিক মূল্য পেতে পারে। ঠিক কথা। আর যার যা দোষ আছে, তাও বিকশিত হওয়ার সুযোগ আছে পুরোপুরি সে দেশে। আমার মধ্যে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া, বাউন্ডুলে, রাক্ষসী আছে, তা ও দেশে না গেলে আমি টেরই পেতাম না। আমেরিকায় না গিয়ে, দেশে থাকলে আমার এইসব গুণপনা চাপা পড়েই থাকত, আমি একটা স্বাভাবিক মেয়ে হিসেবে বাঁচতে পারতাম।

সেটা তো আগে বুঝিনি। যাওয়ার আগে একবার গিয়েছিলাম কলকাতায়। নিজেদের ফ্ল্যাটে ওরকম রুগ্‌ণ পরিবেশে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম দু'দিনেই। নিজের বাবা যদি একটাও কথা না বলে, তা হলে তো আর তাঁর সামনে যেতেই ইচ্ছে করে না। মা আমার কাছাকাছি আসতে চেয়েছিলেন, আমার বিবাহিত

BanglaBook.org

জীবন সম্পর্কে জানতে চাইতেন, কিন্তু আমি হুঁ হাঁ করে এড়িয়ে গেছি। সহজ হতে পারিনি। দাদা তো এক জার্মান মেয়েকে বিয়ে করে আর এদিকে আসেই না। মাসির বাড়িতে গিয়ে বরং আমার কয়েকটা দিন বেশ ভালোই কাটল।

আমার মা একসময় খুব সুন্দরী ছিলেন, তা তো ঠিক। তখনও তাঁর বয়েস বেশি নয়, স্বাস্থ্য ভাঙেনি, কিন্তু সেবার লক্ষ করেছিলাম, তাঁর মুখে যেন গোধূলির ছাপ পড়েছে।

বিদায় দেওয়ার সময় মা আমাকে বলেছিল, জুলি, ছেলেমেয়েরা দূরে সরে যায়, বাবা-মাকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু বাবা-মা কখনও সন্তানদের ভুলতে পারে না। এই যে তোর বাবা, কথা বলতে চান না, অনেক কিছুরই বোধ নেই, তবু তাঁর মনের মধ্যেও তোর জন্য খানিকটা জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে।

অতি সাধারণ কথা। অনেক বাবা-মা'ই এ কথা বলে। তবু কথাটা কেন যে আমার মনে গেঁথে গেল!

আমাদের বিয়ের আট মাস পর গুনি আমেরিকায় ভালো চাকরির প্রস্তাব পায়। অধিকাংশ ভারতীয় মেয়ের মতন আমিও তখন লাফিয়ে উঠে বলেছিলাম, চলো, চলো! আমেরিকা সম্পর্কে তখন আমার মোহ ছিল, নানা দেশ দেখার স্বপ্ন ছিল।

আমরা গেলাম ওয়েস্ট কোস্টে। উত্তর উপকূলে কোথাও গেলে, নিউ জার্সি বা পেনসিলভানিয়ায়, হয়তো খানিকটা শান্ত, সুস্থির জীবন পাওয়া যেত, কিন্তু সানফ্রান্সিসকো তখন যত রাজ্যের নেশাখোর, হুল্লোড়বাজ, যৌনতার অর্গল ভাঙা ছেলেমেয়েদের আড্ডা। আমি বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো কোর্স নিতে গিয়ে তাদের পাল্লায় পড়ে গেলাম।

বিট জেনারেশন শেষ হয়ে গেছে, তাদের উত্তরসূরি হিসেবে

BanglaBook.org

এসে গেছে হিপিরা। তারা বহুরকম সামাজিক বিধিনিষেধ ভাঙছে। হলিউডের সিনেমা দেখে যাই-ই মনে হোক, আমেরিকার সমাজ কিন্তু বেশ রক্ষণশীল। ভিয়েতনামের যুদ্ধ আর তার প্রতিবাদে এই তরুণ প্রজন্ম জোয়ারের ধাক্কার মতন অনেক কিছু ভাসিয়ে দিচ্ছে।

একদিন সুজান নামে একটি মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আজ সন্ধেবেলা আমাদের জয়েন্টে যাবে? সেখানে একটা খুব ভালো ফিল্ম দেখানো হবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, যেতে পারি। আমার হাজব্যান্ডকেও কি সঙ্গে আনতে পারি?

সুজান বলল, তুমি বিবাহিত নাকি? ঠিক আছে, নিয়ে এসো, তাকেও নিয়ে এসো।

গুনি যেতে রাজি হল না। তাকে তার যে মেন্টর, যে অধ্যাপকের অধীনে সে কাজ করছে, ডিনারের পর তাঁর কাছে যেতে হবে।

ততদিনে আমি জেনে গেছি, গুনি খুবই মন দিয়ে বিজ্ঞানচর্চা করে, কিন্তু বিজ্ঞান তার সাধনা নয়। তার কেরিয়ারের সোপান। তা তো হতেই পারে, অনেকেরই তাই হয়, কিন্তু একদিনও কি সে আমার সঙ্গে সন্ধেবেলা বাইরে কোথাও যেতে পারে না?

একটা বাড়ির ছাদের ওপর পরদা টাঙিয়ে দেখানো হবে ফিল্ম। তখনও তো সিডি-ডিভিডি'র যুগ আসেনি। বড় বড় রিলে ফিল্ম দেখাতে হত, তাই সব ফিল্ম জোগাড় করাও সহজ ছিল না। সেদিনকার ফিল্মটির নামও আমার মনে আছে, অরসন ওয়েলসের অসাধারণ ছবি, 'সিটিজেন কেন'।

উপস্থিত ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, একজন

BanglaBook.org

সিগারেট দিচ্ছে অন্যকে, জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরতি। প্রথমে বুঝিনি যে ওগুলো সাধারণ সিগারেট নয়।

ফিল্ম চলছে, তার মাঝখানে সুজান আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এক টান দিয়ে দেখবে নাকি?

তখনও পর্যন্ত আমি সিগারেট খাইনি, কিন্তু সুজানের কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মতন হাত বাড়িয়ে দিলাম। প্রথম টানেই প্রবল কাশি।

সিগারেট নয়, গাঁজা। অত কাশি সত্ত্বেও আমি আবার টান দিলাম, আবার। আমার ভালো লেগে গেল। অর্থাৎ, আমার ভেতরে নেশাটেশা করার একটা ঝোঁক ছিলই, যা দেশে থাকতে প্রকাশ পায়নি। দেশে কে আমাকে গাঁজা ভরতি সিগারেট এগিয়ে দিত? আমাদের মহলে তখনও ওসব চালুই হয়নি।

গাঁজার পর মেস্কালিন, পিয়োটি, কতরকম নেশার দ্রব্য। সেই সঙ্গে অ্যালকোহল। কোনওটাই বাদ রইল না। আমি রীতিমতন নেশাখোর।

এরা যৌনতার কোনও রীতিনীতির ধার ধারে না, ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড কথাটা বেশ চালু। অর্থাৎ প্রেম, ভালেবাসা, দায়িত্ব-টায়িত্বর কোনও প্রশ্ন নেই, পরস্পর চুম্বকের মতন আকৃষ্ট হলে কোথাও শুয়ে পড়লেই হল।

একদিন মাইকেল নামে একটি গ্রিক ছেলে বলল, হেই, রাডা, আমি আজ খুব লোনলি ফিল করছি, তুমি আমার সঙ্গে আজ আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবে?

গ্রিক শুনলে যেরকম আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার চেহারার কথা মনে আসে, মাইক কিন্তু সেরকম নয়। বেশ ছোটখাটো চেহারা, সে আবার কবি। আমার রাডা নামের রহস্য হল, ওদের কয়েকজন একদিন জানতে চেয়েছিল, আমার নাম রেবেকা

BanglaBook.org

কেন? এটা তো ভারতীয় নাম নয়। জুল নামটা শুনেও ওরা মাথা নেড়েছিল। তখন বলেছিলাম, আর একটা নাম রাধারানি। ওরা দু'-একজন রাধাকৃষ্ণের কাহিনি জানে, 'হরে রাম, হরে রাম, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' এই গানের দৌলতে কৃষ্ণ বেশ জনপ্রিয়। ওরা পছন্দ করল রাধা নামটা। কিন্তু কেন যে গায়ের চামড়া সাদা হলেই রাধার মতন একটা সহজ নাম উচ্চারণ করতে পারে না, কে জানে!

বলাই বাহুল্য, আমি মাইকের প্রস্তাবে রাজি হইনি।

একজন বিবাহিত মেয়েকে এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়াটাই তো অমার্জনীয় অপরাধ। আবার অপরাধও নয়। প্রস্তাব একজন দিতেই পারে, আর তুমি তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারো। ব্যস, চুকে গেল।

আমি ওদের নেশার আড্ডায় যোগ দিলাম বটে, কিন্তু মুক্ত যৌনতায় অংশগ্রহণ করিনি।

সুজানের অ্যাপার্টমেন্টটা বিচিত্র ধরনের। একটাই লম্বা হলঘর, কোনও দেওয়াল নেই, এমনকী রান্নাঘরও নেই, শুধু একটা আলাদা বাথরুম। সেই হলেরই এক পাশে সামান্য রান্নার ব্যবস্থা, সারা হলটায় 'চেয়ার-টেবিল-সোফাটোফা কিচ্ছু নেই। ফ্লোরে বসেই আড্ডা, সেখানেই শোওয়া। এক সন্ধেবেলা আমরা জনাসাতেক জড়ো হয়েছিলাম সেখানে, প্রচুর নেশার পর সবাই শুয়ে পড়ল, একসময় দেখলাম, সুজান আর ডোরি নামের একটি মেয়ে, সব পোশাক খুলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। ওরা লেসবিয়ান। আর টম, যার নাম দিয়েছিলাম আমরা টম দ্য কেয়ারটেকার, কারণ তাকে যখন যে কাজের জন্য অনুরোধ করা হত, সে নিঃশব্দে তা পালন করত। আর রাশি রাশি সিগারেটে গাঁজা ভরার দায়িত্বও

BanglaBook.org

তার। সেই টম লিন্ডা নামের খুব বড়সড় চেহারার একটি মেয়ে, প্রায় ছ'ফুট উচ্চতা, সেরকমই স্বাস্থ্য, তার দুই উরুর মাঝখানে মুখ গুঁজে দিল।

এসব দৃশ্য তো হজম করা আমার পক্ষে শক্ত, তাই তখনই আমি সরে পড়েছিলাম সেখান থেকে। তারপর বেশ কিছুদিন আমি আর ওই আড্ডায় যাইনি।

পড়াশুনোয় মন দিয়ে আমি চেয়েছিলাম গুনির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্বাভাবিক করে নিতে। আমি তাকে আস্তে আস্তে আদর করতাম, তার শরীরটা জাগাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, তার শরীরের প্রয়োজন সপ্তাহে মাত্র একদিন। এটা যেন রুটিন। সে গান-বাজনা শুনতে ভালোবাসে, তাকে বলতাম, চলো, একদিন লাইভ কনসার্ট শুনতে যাই, সে রাজি হয় না, রেকর্ড বাজানোই তার পক্ষে যথেষ্ট। এখানে তার কর্নাটকের কিছু বন্ধু আছে, তাদের কাছে যায় মাঝে মাঝে, আমাকে একবারও নেয় না। কারণটা বোধহয় এই, ওরা নিজেরা মিলিত হলে ইংরেজির বদলে নিজেদের ভাষায় আড্ডা দেয়, আমি গেলেই তো সবাইকে ইংরেজি বলতে হবে।

একদিন আমি ঠিক করলাম, বন্ধু হিসেবে গুনি খুব ভালো, সপ্তাহে একদিন তার সঙ্গে দেখা হলে চমৎকার সময় কাটবে, কিন্তু দিনের পর দিন এক ছাদের নীচে স্ত্রী হিসেবে থাকা যায় না।

আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেল। সেই আমার ভাঙনের শুরু।

আমি একটা লাইব্রেরিতে এর মধ্যে কাজ পেয়ে গেছি, সুতরাং আর্থিকভাবে মুক্ত। নিজে একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে নিলাম।

BanglaBook.org

ওয়েস্ট কোস্টে, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে বাঙালি আছে প্রচুর। এই দিকে চাকরির সুযোগ পেলে অনেকেই লুফে নেয়, কারণ, এদিকে আবহাওয়া অনেক ভালো। খুব শীত পড়ে না, গরমও তেমন নয়। জানুয়ারি মাসে নিউ ইয়র্ক কিংবা বোস্টন শহরে যখন রাস্তায় অন্তত দু'ফুট বরফ জমে যায়, তখন সানফ্রান্সিসকো পরিষ্কার, ঝকঝকে। মাঝে মাঝে খুব ঝোড়ো হাওয়া দেয়, সে সময় বাড়ি থেকে না বেরোলেই হয়।

আমার স্বামী বাঙালি নয় বলে, আসামাত্র এখানকার বাঙালি সমাজের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি। পরে কয়েকজনের সঙ্গে দোকানপাটে কিংবা ট্রেনে দেখা হয়েছে, দু'-চারটে শুকনো ভদ্রতার কথা ছাড়া আমি মেলামেশায় তেমন আগ্রহ বোধ করিনি। কিন্তু ওঁরা আমার ওপর নজর রাখতেন নিশ্চয়ই। কিছুদিন পর যখন আমার চরম উচ্ছৃঙ্খল জীবন শুরু হয়, তখন এক মহিলা, তিনি নিজেকে বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে পরিচয় দিয়ে টেলিফোনে আমাকে খুব ধমকেছিলেন। ঠিক সেই সময়টায় আমি বড্ড নেশা করেছিলাম। নইলে খারাপ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, অভদ্র ব্যবহার করা আমার স্বভাবে নেই, তবু মহিলার কড়া কড়া কথা শুনে, নেশার ঝোঁকে বলে ফেলেছিলাম, তুমি নিজের পাছার কাপড়টাই সামলাও না দিদি! বাংলায় নয়, ইংরেজিতে।

তারপর থেকে ট্রেনে কিংবা শপিং মলে কোনও বাঙালির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলেই তারা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিত। ওদের মধ্যে রটে গিয়েছিল যে, আমি একটা দুশ্চরিত্র, নষ্ট মেয়ে। ওরা কেউ আমার সঙ্গে আর মিশবে না, কিন্তু আমার সম্পর্কে কৌতূহল কমেনি, তার প্রমাণ পেতাম মাঝে মাঝে।

BanglaBook.org

আমি যে সুজানদের দলটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তার কারণ শুধু এই নয় যে এরা সব নষ্ট, নেশাখোর, শরীরলোভী, ঘরভাঙা ছেলেমেয়ে। এদের সঙ্গে আমার, যাকে বলে চিন্তাধারারও মিল হয়েছিল। আর লিন্ডা নামের যে মেয়েটির কথা আগে বলেছি, যে প্রায় ছ'ফুট লম্বা ও মেয়ে-দৈত্যের মতন চেহারা, সে একটা কলেজে দর্শনের অধ্যাপিকা, নিৎসে সম্পর্কে তার দুটো পেপার আছে। সুজান নিজেও অ্যাসট্রোফিজিক্স নিয়ে এমএস করে ফেলেছে। আর টম, যাকে সবাই একাজ-সেকাজের ভার দেয়, সে একজন কবি। নিতান্ত এলেবেলে নয়, এভারগ্রিন রিভিউয়ে নিয়মিত তার কবিতা ছাপা হয়। আর বিট জেনারেশনের অন্যতম কবি, লরেন্স ফের্লিংগেটি, যাঁর এখন একটি ছোট্ট প্রকাশনালয় আছে এখানে, তিনি টমকে একটা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বলেছেন।

অর্থাৎ, এরা জেনেশুনে নিজেদের ভাঙছে। এ একরকমের সামাজিক প্রতিবাদ। এরা বলে বিপ্লব। এক-একটা দেশে এক-এক ধরনের বিপ্লব। কোথাও হয় বোমা-বন্দুকের সাহায্যে, কোথাও কিছু কিছু অনড় সামাজিক প্রথা ভেঙে। সামগ্রিকভাবে, বিট জেনারেশন ও হিপিরা যে আত্মম্ভরী আমেরিকান সমাজের অনেক প্রথা ভেঙে দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটা ছোট্ট উদাহরণ, অনেক রেস্তরাঁর বাইরে এখন লেখা থাকে, খালি-পা আর ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও পোশাক না থাকলে প্রবেশ নিষেধ! এক দশক আগেও কি কেউ কল্পনা করতে পারত যে এই সাহেবদের দেশে কেউ খালি পায়ে, জামা না পরে রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে?

নারীবাদী আন্দোলনও তখন নানা রূপ নিয়েছে। সিমোন

BanglaBook.org

দ্য বোভোয়ার রচনা তখন প্রেরণা দিচ্ছে অনেককে। আর একটা বই, বেটি ফ্রিডান্‌স-এর 'দ্য ফেমিনিন মিসটিক'ও খুব আলোড়ন তুলেছে। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সমান অধিকারের নানা দাবি ছাড়াও, আর একটি দাবি, নারীর নিজের শরীরের স্বাধীনতা। বহু কাল ধরেই তো নারী আসলে নিজের শরীরটা পুরুষের ইচ্ছেমতন ব্যবহার করতে দিয়েছে, বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অনেক সামাজিক প্রথাই তো পুরুষের প্রতি প্রযোজ্য নয়, নারীকে আটকে রাখার জন্য। বিয়েটাও তো প্রায় তাই। মেয়েদের পোশাক, ফ্যাশন সবই তো পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। শুরু হল ব্রা পোড়ানো। জারমেইন গ্রিয়ার বলে বসলেন, ব্রা অতি হাস্যকর আবিষ্কার। ব্রা অবশ্য পোড়ানো হয়নি কখনও, এটা এক সাংবাদিকের রটনা, আসলে, ষাটের দশকেই মেয়েরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে ব্রা, হাই হিল জুতো, নকল অক্ষিপল্লব, চুলের কার্লার, প্লে বয় ম্যাগাজিন ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল এক জায়গায়। সেটাই যেন শরীরের স্বাধীনতার জয় ঘোষণা।

গুনির সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর, আমি কিছুদিন জোট বাঁধলাম জো বল্ডউইনের সঙ্গে। সে একজন কৃষ্ণাঙ্গ হাওয়াইয়ান গিটার বাদক। চমৎকার ছেলেটি, আমারই সমবয়েসি, তার সঙ্গে আমি ঘুরতে লাগলাম কয়েকটা জায়গায়, বিগ সুর, অ্যারিজোনার টুস্‌ন, লাস ভেগাস, শিকাগো। ভারতীয়রা এখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে মেশে না, আমি জো'র সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। তবু তিন বছর পর তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, মাঝখানে অন্য একটি মেয়ে এসে পড়ায়। সে বড্ড ঝঞ্ঝাট শুরু করেছিল। সানফ্রানসিস্কোতে আমার চাকরিটা অবশ্য বজায় ছিল, এরপর আমি আর কারওর সঙ্গে

BanglaBook.org

জোট বাঁধিনি, সুজানদের দলের উদ্দাম জীবনযাত্রায় মিশে গেলাম, যৌনতার কোনও দ্বিধাই আর মনে আসেনি।

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। শরীর বিষয়ে সবরকম নৈতিকতা অস্বীকার করতে পেরেও, এক-একবার, কোনও পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম শুরু করার মুহূর্তে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতন দেখতে পেতাম আমার ন'-দশ বছরে দেখা সেই দৃশ্য, একজন পরপুরুষের আলিঙ্গনে আমার মা। কেন দেখি? কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। এর মধ্যে তো পাপ-পুণ্য সম্পর্কে আমার সব সংস্কার ঘুচে গেছে। তবু দেখি!

থামলাম সাড়ে ছ'বছর বাদে। একটা কবিতাপাঠের আসরে কোনও কবির একটা লাইন আমায় মনে বিঁধে গেল। 'ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কাম হোম।' এই লাইনটা আমি বারবার বিড়বিড় করতে লাগলাম। 'ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কাম হোম।' আমার হোম কোথায়? কোথায় আমি ফিরব?

বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। প্রথম প্রথম মা ফোন করতেন, মামুলি কথা হত, তুমি কেমন আছ, বাবা কেমন আছে, ভালো আছি ইত্যাদি। ইদানীং প্রায় দু'বছর কোনও যোগাযোগ নেই, আমার ফোন নাম্বার বদলে গেছে, তাও জানাইনি। জার্মানিতে আমার একটা দাদা আছে, তার সঙ্গেও অনেকদিন কথা হয় না, এমনকী তার ফোন নাম্বারও আমি জানি না।

এসব দেশে অবশ্য শহরের নাম জানলে ফোন নাম্বার বার করা শক্ত কিছু নয়। দাদা থাকে বার্লিনে, ওদের সময় আমাদের থেকে ছ'ঘণ্টা এগিয়ে, সেটা আমার খেয়াল ছিল না। সন্ধেবেলা দাদাকে ফোন করলাম, তখন ওখানে মধ্যরাত, দাদা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল।

BanglaBook.org

সেদিন অন্য কোনও নেশা করিনি, একটু একটু টাকিলায় চুমুক দিচ্ছিলাম। আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, দাদা, তুমি কি জানো যে তোমার একটা বোন আছে? নাকি ভুলে গেছ?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দাদা বলল, আমার বোনের যে একটা দাদা আছে, সেটা কি তার মনে আছে? একদম ফোনটোন করিস না। একবার জার্মানিতে এলেও তো পারিস।

আমি বললাম, আমাদের একজন বাবা আর একজন মা-ও ছিল। আমরা কি জানি, তাঁরা বেঁচে আছেন কি না!

মধ্যরাতে ফোন করে লোকে সাধারণত দুঃসংবাদ দেয়। ওইভাবে বলা হয়তো আমার উচিত হয়নি, দাদা খুব চমকে গিয়ে বলল, অ্যাঁ? কী হয়েছে? বাবা? কী হয়েছে?

আমি বললাম, কী হয়েছে তাও তো আমি জানি না। তোমার কাছে খবর জানতে চাইছি।

দাদা আমতা আমতা বলল, বাবা এখন হুইলচেয়ার ছাড়া চলতে পারেন না। এমনিতে তো আর কিছু, মানে, মাস ছয়েক আগে আমাদের মাসতুতো ভাই দীপু এসেছিল বার্লিনে, তার কাছে যা শুনেছি, টাকাপয়সার কোনও অসুবিধে নেই, না হলে আমি কিছু পাঠাতে পারতাম।

দাদা, তোমার কি মনে হয় না যে আমরা আমাদের রুট্‌স ছিঁড়ে ফেলেছি, কেউ কারওর খবর রাখি না। কিন্তু একবারও কি মনে পড়ে না, আমাদের ছেলেবেলা, বাবা-মা, ওঁরাই তো আমাদের খরচ করে পড়াশুনো চালিয়েছেন, বাবা কথা বলতে পারেন না, তবু তাঁর মনের মধ্যে হয়তো কখনও কখনও আমাদের চিন্তা তোলপাড় করে তোলে। 'ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কাম হোম।'

BanglaBook.org

কী বললি?

একবারও কি আমাদের বাড়ি ফেরা উচিত নয়? চলো না, দু'জনে একসঙ্গে যাই, বেশি দিনের জন্য নয়, দু'-তিন সপ্তাহ, বাবা-মায়ের পাশে গিয়ে বসি।

তুই যেতে চাস?

দু'দিন ধরে এই চিন্তাটা আমাকে বড় উতলা করে দিচ্ছে।

জুলি, তুই চাইলে আমরা একসঙ্গে, হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে। কবে যেতে চাস বল তো?

এই সপ্তাহেই। দেরি করলে হয়তো আমার এই ইচ্ছেটা আবার চলে যাবে।

এই সপ্তাহেই? তুই বোধহয় জানিস না, আমার স্ত্রী আবার প্রেগন্যান্ট, অ্যাডভান্সড স্টেজ, আমার থার্ড চাইল্ড আসছে, এই অবস্থায় তো আমার পক্ষে, তুই বরং মাস তিনেক পর একটা দিন ঠিক কর।

খুব জোরে রিসিভারটা রেখে দেওয়ার আগে আমি বললাম। টু হেল উইথ ইউ, রণ দত্ত! তুমি তোমার বউ বাচ্চাদের নিয়েই থাকো!

আমি টিকিট কেটে ফেললাম। দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেই ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি মনে আসছে।

ঢাকা শহরে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, অনেকটা ইচ্ছে করেই, তখন আমার মনের মধ্যে মা সম্পর্কে একটা চাপা রাগ ছিল, মা'র মুখে দিকে ভালো করে তাকাতামই না। বাবা-মা সেদিন আমায় একটুও বকুনি দেননি। আমার বাবার মতন মার্জিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আমি আর দেখিনি। সেই বাবা, এখন... মায়ের জীবনটা এখন...

BanglaBook.org

প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে আমি বারবার বিড়বিড় করতে লাগলাম, ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কাম হোম। রাধারানি দত্ত বাড়ি ফিরছে। রাধারানি, না রেবেকা? আমার একটাও শাড়ি নেই, জিন্স আর টপ পরেই যেতে হবে মা-বাবার কাছে। উপায় কী?

কলকাতায় কারওকেই কোনও খবর দেওয়া হয়নি। দমদম থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আয়রন সাইড রোডের ফ্ল্যাটে। জানি, বাড়িতে কেউ না কেউ থাকবেই। পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত সাড়ে আটটা।

দরজা খুলে দিল একটি মেয়ে। সে আমাকে চেনে না, আমিও তাকে চিনি না। নতুন কাজের মেয়ে নিশ্চয়ই। এটা আমার নিজের বাড়ি, তবু এখানে প্রবেশ করতে হলেও তো আমাকে পরিচয় দিতে হবে। অচেনা কারুকে সে রাত্তিরবেলা ভেতরে যেতে দেবে কেন?

মেয়েটি মাকে ডেকে আনল।

মা প্রথমে প্রায় স্তম্ভিতের মতন বলল, জুলি! তুই এসেছিস।

কয়েক মুহূর্ত পরে সাধারণ গলায় বললেন, আয়, ভেতরে আয়।

আমাকে জড়িয়ে ধরা-টরার মতন নাটকীয় কিছু করলেন না। হয়তো ভেবেছেন, ওসব আমি পছন্দ করব না। আমি বললাম, চলো, আগে বাবাকে দেখে আসি।

সামনের গোল বারান্দায় একটা হুইলচেয়ারে ঘুমিয়ে আছেন বাবা। চেহারাটা যেন খানিকটা ছোট হয়ে গেছে, তবে মুখটা বিশেষ বদলায়নি। ঘুমন্ত মুখে শান্ত ভাব। এই অবস্থায় প্রণাম করারও কোনও মানে হয় না।

BanglaBook.org

মাকে প্রণাম করতেই মা বললেন, রণ কেমন আছে রে?

জানি, মা বরাবরই দাদাকে বেশি ভালোবাসে। সেটাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

আমি বললাম, ভালো আছে। তোমার তৃতীয় নাতি বা নাতনি হতে যাচ্ছে শিগগিরই। শীতকালে বোধহয় আসবে সবাইকে নিয়ে।

মা বললেন, সে যখন সুবিধে হয় আসবে। ভালো থাকলেই ভালো। তোর মুখখানা এমন কালিবর্ণ হয়ে গেছে কেন রে জুলি? কত রোগা হয়ে গেছিস। আমেরিকায় গেলে সবারই স্বাস্থ্য ভালো হয় শুনি।

আমি হেসে বললুম, এখানে এসে কয়েকদিন ডালভাত খেলেই আমার শরীর আবার ঠিক হয়ে যাবে।

মা বললেন, তোর কি এখানে থাকতে ভালো লাগবে, না তুই মাসির বাড়ি চলে যাবি? ওখানে তুই...

মা, এটাই তো আমার বাড়ি। আমি বাড়িতে ফিরেছি। আমার জন্য আলাদা ঘরও তো আছে দেখছি। একবার মুর্শিদাবাদের বাড়িতেও যাব ঠিক করে এসেছি।

সে বাড়ি আর নেই। ফ্ল্যাট বাড়ি হয়ে গেছে।

দুই বয়েসের দু'জন নারী। আলগা আলগা কথাবার্তা। যেন কোনও নাড়ির সম্পর্ক নেই। অনেক দিনের বিচ্ছেদ হলেও মায়ের কাছে কি তার সন্তান ফিরে আসতে পারে না? মা'র প্রতি আমি অভিমান করেছি, অবিচারও করেছি কিছুটা, তা কি ভুলতে পারবে না মা?

BanglaBook.org

স্নানটান করে, অনেকদিন পর ভাত, ডাল আর ট্যাংরা মাছের ঝোল খেয়ে মা আর আমি এসে বসলাম বারান্দায়।

বাবাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বারান্দার আলো নিভিয়ে দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মা, তোমার সামনে আমি সিগারেট খেতে পারি?

মা বললেন, খা, দিনে ক'টা খাস?

কিছু টুকটাক কথাবার্তার পর আমি মাকে বললাম, তোমাকেই এখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি, তুমি কেমন আছ?

মা বললেন, আমি? আমি তো ভালো আছি বেশ। ওষুধ-টষুধ খেতে হয় না।

কিন্তু এই যে বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকা, বছরের পর বছর, তুমি শেষ কবে কোনও থিয়েটার বা সিনেমা দেখতে গেছ?

মা বললেন, বন্দি কেন হব। মাঝে মাঝে বেরোই তো। তোর বাবা যখন ঘুমোয়... হ্যাঁ। একটা থিয়েটারও দেখতে গিয়েছিলাম, হাবিব তনবীরের, বোধহয় প্লে-টার নাম ছিল 'চরণদাস চোর', খুব ভালো লেগেছিল।

কতদিন আগে?

তা বছর দেড়েক তো হবেই।

তারপর আর কোথাও যাওনি? মা, সত্যি করে বলো তো, এই যে অসুস্থ স্বামী, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তার হুইলচেয়ার ঠেলা, তোমার ক্লান্ত লাগে না? পতিসেবায় পুণ্য-টুন্য বাদ দাও, ক্লান্ত লাগে না?

না, সত্যি বলছি, লাগে না। এখনও মনে হয়, তোর বাবা হঠাৎ একদিন উঠে দাঁড়াবেন, আবার কথা বলবেন, হাসবেন। সেরকম তো হয় কখনও কখনও, তাই না?

হ্যাঁ, তা হয়। কিন্তু অসুখের কোন স্টেজ পর্যন্ত, আমি তা ঠিক...

BanglaBook.org

আচ্ছা জুলি, একটা কথা বল তো? আমারই কোনও পাপের জন্য তোর বাবার এই অবস্থা হয়েছে? দু'-একজন আত্মীয়স্বজন এসে আমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন এরকমই একটা ইঙ্গিত করতে চায়।

মা, এমনও তো হতে পারে, বাবার নিজের কোনও পাপের জন্য এই অবস্থা হয়েছে শুধু নয়, তোমার জীবনটাও শেষ করে দিয়েছে। তোমার জীবনের সাধ-আহ্লাদ সব শেষ। দেড় বছর আগে একবার বেরিয়েছিলে... কোনও মানে হয়? বাবাই তো তোমার চরম ক্ষতি করেছেন। মেয়েদের জীবনের বঞ্চনার দিকটা অনেকেই বোঝে না।

না, না, ওভাবে বলিস না। একসময় যে মানুষটার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, কত সুখের দিন কাটিয়েছি একসঙ্গে, সেই মানুষটা অসুস্থ হয়ে পড়লেই কি আগেকার সব কথা ভুলে যাওয়া যায়?

প্রশ্নটা খুব কঠিন। সেই সুখের স্মৃতি কতকাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়? নিজের জীবনটা নষ্ট করেও...

এই সময় সারা পাড়ারই আলো নিভে গেল। আকাশ আজ মেঘলা, চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার, এখন আর শহরের কোনও অস্তিত্বই নেই যেন। কলকাতার এই রূপ আমি আগে দেখিনি।

মা বললেন, একটা ইনভার্টার আছে, তাতে দুটো আলো আর পাখা চলে। তোর গরম লাগলে পাখাটা অন্তত চালিয়ে দিয়ে আসি।

না থাক। কোনও দরকার নেই। খুব একটা গরম লাগছে না। ইনভার্টার? এরকম কোনও যন্ত্রের নামও শুনিনি আগে। তোমাকে উঠতে হবে না, বসো। মা, একটা সময় তোমাকে

BanglaBook.org

আমি কাছে পাইনি, তারপর আমিও দূরে সরে গিয়েছিলাম, সরতে সরতে অনেক দূরে গিয়ে একদিন মনে হল, কীরকম যেন ফাঁকা ফাঁকা, কেউ নেই। এই কেউ নেই ফিলিং থেকেই মনে পড়ে বাবা-মায়ের কথা। আর কেউ না থাকলেও বাবা-মা থাকে। কীরকম যেন ভয় করতে লাগল। তাই, এই আর কী, চলে এলাম।

জুলি, এতদিন পরে এসেছিস, কী যে ভালো লাগছে। ছেলেমেয়েরা তো আমাদের আত্মার এক-একটা টুকরো। একজন দার্শনিক কী বলেছেন জানিস? মানুষ কি একসঙ্গে দুটো আত্মা কিংবা দুটো প্রাণ ধারণ করতে পারে? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, তা পারে না! একসঙ্গে দুটো প্রাণ? অসম্ভব! কিন্তু আসলে পারে, মেয়েদের মধ্যে যারা মা, যাদের পেটের সন্তানদের বয়েস আট-ন' মাস, তাদেরও তো প্রাণ থাকে। সেই প্রাণ তারা বাবা আর মায়ের বীজ থেকে পায়, আর মাকেই তো বেশ কয়েক মাস তা ধারণ করতে হয়। আমাদের সেই প্রাণের টুকরো নিয়ে সন্তানরা যতই দূরে চলে যাক, টান থেকেই যায়।

আজ ইচ্ছে করছে, সারা রাত গল্প করব। তোমার আপত্তি নেই তো? আমার তো জেট ল্যাগ চলবে, সহজে ঘুম আসবে না।

ওদেশে কেমন ছিলি রে? কখনও বিপদে-টিপদে পড়িসনি তো?

আমার কথা সব আস্তে আস্তে বলব। আমার জীবনযাত্রার কথা হয়তো এ দেশের অনেকের কাছে খুব শকিং আর ইয়ে, কী বলে, নীতিহীন মনে হতে পারে। কিন্তু মা, আমি ইচ্ছেমতন

BanglaBook.org

স্বাধীন জীবন কাটিয়েছি, কখনও কারওর ক্ষতি করিনি, এটুকু বলতে পারি।

তোর বিয়েটা টিকল না, যখন জানলাম...

এটা জেনে রাখো, এমন শান্তিপূর্ণ বিবাহবিচ্ছেদ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি হয়নি। এখন ও কথা থাক। তুমি যে তখন বললে, তোমার কোনও পাপের জন্যই বাবার এই অবস্থা হয়েছে কিনা, আমার মতে, পাপ-পুণ্যের যে কনসেপ্ট দুটোই আপেক্ষিক, এক-একটা সমাজে পাপ-পুণ্যের ধারণাও আলাদা। কিন্তু আমি জানতে চাই, তোমার মতে যা পাপ, তুমি কি কখনও সেরকম কোনও পাপ করেছ?

কেন জানতে চাইছিস রে? সেসব কথা কি ঠিকঠাক বুঝিয়ে বলা যায়?

এমনিই কৌতূহল। তোমাকে তো বলেইছি, পাপ-পুণ্যের কোনও গুরুত্ব আমার কাছে নেই। তুমি যদি বলো, তা হলে পরে আমার জীবনের কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলা সহজ হবে।

মা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবছা গলায় বললেন, পাপ, না, কী জানি, হয়তো অন্যদের কাছে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি জীবনে জ্ঞানত কোনও মন্দ কাজ করিনি।

আমি একটু হেসে বললাম, আচ্ছা, পাপের কথা থাক। তুমি বিয়ের আগে বা পরে প্রেম করেছ?

মা-ও হেসে বললেন, দুর ছাই, সেরকম কিছুই হল না। তোর মনে নেই মামাবাড়ির কথা? খুব কনজারভেটিভ পরিবার, বাড়ির গাড়িতে কলেজে গেছি, সেই গাড়িতে ফিরেছি। বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগই ছিল না। ওই মামাতো-

BanglaBook.org

পিসতুতো ভাই, তাদের দু'-একজন বন্ধু ছোঁক ছোঁক করত, আমি পাত্তাই দিইনি।

বিয়ের পরেও কিছু হয়নি?

নাঃ। তোর বাবার প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল, তার বউয়ের ধারে কাছে আসার সাহস কারওর ছিল না।

বাবা তো অনেক সময় দূরে থাকতেন। তখনও কারওর সঙ্গে তোমার প্রেম হয়নি? তুমি খুব অ্যাট্রাক্টিভ ছিলে।

তাই নাকি? নিজের মা সম্পর্কে সব ছেলে-মেয়েই এ কথা ভাবে!

সেরকমভাবে বলছি না। নারী হিসেবে... অনেকেই তোমার দিকে এমনভাবে তাকাত... সত্যি, তোমার জীবনে কোনও অ্যাফেয়ার হয়নি?

দুর! প্রেম কি এক দিক থেকে হয় নাকি? অন্য কেউ চাইলেও আমার দিক থেকে তো কোনও অভাব বোধ ছিল না। আমার ওসব কিছু মনেই আসেনি। এটা একেবারে সত্যি কথা।

মা—

শোন, শোন জুলি, তোকে একটা ঘটনার কথা বলি। আজ পর্যন্ত আর কারুকে বলিনি, তুই শুনে দেখ তো! প্রেম-ট্রেম কিছু না, তবু একটা ব্যাপার... সেটা অন্যায় ছিল কি না আমি আজও জানি না। বাংলাদেশের যুদ্ধের দিনগুলোর কথা তোর মনে আছে? তুই তখন খুব ছোট ছিলি।

হ্যাঁ, বেশ ভালোই মনে আছে। আমি তো তখন খুব ছোট নই।

আমরা সবাই তখন মুর্শিদাবাদের গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। কবুতরহাটিতে প্রচুর রিফিউজি এসেছিল, তাদের জন্য রিলিফ

BanglaBook.org

ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। তার তদারকিতে আমি খানিকটা জড়িয়ে পড়েছিলাম। খুব ব্যস্ত থাকতে হত। তোর আর রণেরও দেখাশুনো ঠিকমতন করতে পারিনি। তার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হল। রিলিফ ক্যাম্পের কাছে আমার একটা ছোট্ট অফিসঘর ছিল। একদিন দেখি কী, সেই ঘরের টেবিলের দ্বিতীয় ড্রয়ারে কেউ চুপিচুপি একটা খাম রেখে গেছে। সেটা একটা প্রেমপত্র।

বাঃ!

শোন না। আমি তো তখন মাঝবয়েসি এক মহিলা, দুটো ছেলেমেয়ে, আমাকে কেউ...

তুমি তখনও যথেষ্ট সুন্দরী ছিলে। ছবি আছে।

হাতের লেখাটা খুব ভালো। বাংলা। একটাও বানান ভুল নেই। প্রচুর উচ্ছ্বাস।

মা, প্রেমপত্র কেমন হয়?

তোরা তো বাংলা বেশি পড়িসনি। ঠিক বুঝবি না। সেই পত্রলেখক দূর থেকে আমায় দেখে কত মুগ্ধ, আমি যেখান দিয়ে হেঁটে যাই, সেই মাটিতে পদ্মফুলের গন্ধ হয়... এইসব আর কী!

সেক্সটেক্স-এর কথা কিছু নেই?

না, না, ওসব কিছু না। অসভ্যতার কোনও ব্যাপার নেই... চিঠিটা আমি ফেলে দিয়েছিলাম, কোনও গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু দু'দিন বাদে আবার ঠিক ওই ড্রয়ারে আর একটা খাম। এবারেও প্রায় একই রকম, কোনও দাবি নেই, আমার কাছে সে কিছু চায় না, শুধুই স্তুতি। যেন লিখেই সে আনন্দ পাচ্ছে, আমি পড়লেই সে ধন্য! এরকম আরও দুটো খাম আসার পর আমার মনে হল,

BanglaBook.org

এবার এটা থামানো দরকার। কোনও নাম তো থাকে না, কে লিখতে পারে?

তাই তো। তুমি তখন ফেমাস বসুধা দত্ত, ইন্দিরা গাঁধী তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তোমাকে প্রেমপত্র লেখার সাহস কার হবে?

যাঃ, মোটেই ইন্দিরা গাঁধী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছিলেন, তখন আমার সঙ্গে দেখা হয়। ও কথা বাদ দে। আমার মনে হল, আমাদের গ্রামের কেউ এ চিঠি লিখবে না। রিফিউজিরা মরছে নিজের জ্বালায়, তাদেরই বা কে লিখবে? খালের ওপারে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির, সেখানকার ছেলেরা আসত মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। ওদের গ্রুপ লিডার ছিল ওসমান, তার বয়েস বছর পঁয়তিরিশেক, বাকি সব তো বাচ্চা ছেলে, কুড়ি-বাইশের মধ্যে বয়েস। ওসমান ও চিঠি লিখবে না, তার স্বভাব ছিল কাঠখোট্টা ধরনের, তার বাংলাও ভালো নয়। চিঠিগুলোর মধ্যে ছেলেমানুষি ভাবই বেশি, একটা চিঠিতে ছিল, আমি কোনও অনাত্মীয় নারীর মুখোমুখি বসিনি আজ পর্যন্ত...ওই ছেলেদের মধ্যে তিনজনই বেশি করে আসত আমার কাছে, তিন বন্ধু।

বাড়িতেও আসত। আমরা তাদের কাকু বলতাম। কী যেন নাম ছিল তাদের?

মনিরুল, স্বপন আর জহির। ওদেরই কি কেউ চিঠি লেখে? মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। কেউ ওসব কিছু বলে না। আমিও জিজ্ঞেস করতে পারি না। এর মধ্যে কয়েকদিন পরেই তো প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তারই মধ্যে একদিন, শেষ

BanglaBook.org

রাত্তিরে, তোর মনে আছে তো, ও বাড়িতে কয়েকটা উঁচু-নিচু ছাদ ছিল, তুই আর রণ থাকতিস এক ঘরে, আর অন্য ঘরে আমি অসুস্থ পিসিমার সঙ্গে...এক রাত্তিরে কোনও কারণে আমি বাইরে এসে দেখি, একটা ছাদের পাঁচিলের ধারে গুটিসুটি মেরে একজন মানুষ বসে আছে। আমি চমকে উঠলেও ভয় পাইনি, কাছে গিয়ে দেখি, সে ওই তিন বন্ধুর একজন, স্বপন, আমাকে দেখেই হাত জোড় করে বলল, ভাবী, আমায় মাপ করবেন। আমি কিছু চাইতে আসিনি, শুধু আপনাকে, মানে, আপনি অত কাছাকাছি একটা ঘরে শুয়ে আছেন, এই চিন্তাটাই আমার পক্ষে...আপনার মতন কোনও নারীকে তো আমি কখনও শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখিনি, হয়তো জীবনে দেখবও না, শুধু এইটুক আর যদি একবার হাত ছুঁতে পারি...

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমিই চিঠি লেখো। সে চুপ করে রইল। কিন্তু চিঠি লেখা এক, আর এইভাবে ছাদে এসে বসে থাকা, এ তো একেবারে পাগলামি। প্রশ্রয়ও দেওয়া যায় না, আর বকুনি দিলেও ফল খারাপ হতে পারে। আমি খুব অনুনয়ের সুরে বললাম, স্বপন, তুমি এ কী করছ বলো তো? তুমি কি চাও, আমার নামে এই সময় একটা বদনাম ছড়াক? তোমাকে আমাকে এখানে কেউ দেখে ফেললেই তো খারাপ কিছু ভাববে, তাতে তোমার চেয়েও আমার ক্ষতি হবে বেশি। এরকম কোরো না, এক্ষুনি চলে যাও, প্লিজ।

সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমায় ক্ষমা করুন, আর কখনও এসব করব না। এই বলেই সে তড়াক করে পাঁচিল ডিঙিয়ে নেমে গেল।

মা একটু চুপ করলেন। আমার একটু খটকা লাগল। শৈশবে

BanglaBook.org

যে-দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম, তার সঙ্গে তো এটা ঠিক মিলছে না। মা কি তা হলে কিছুটা গোপন করে যাচ্ছেন? এত দূর এসেও?

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মা বললেন, পরের রাতে সে আবার এসে হাজির। সে রাতে আবার একটু একটু জ্যোৎস্না ছিল।

এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই তিন বন্ধুর মধ্যে স্বপন ঠিক কোন জন বলো তো?

মা বললেন, বেশ লম্বা, রোগা পাতলা, মুখে অল্প অল্প দাড়ি, লাজুক ধরনের, বন্ধুদের মধ্যে সেই সবচেয়ে কম কথা বলত। তার নাম সওকত সাহাবুদ্দিন বা এই ধরনের কিছু, ডাকনাম স্বপন, সেই নামেও সবাই ওকে ডাকে। ওকে দেখে আমার মায়া হল, আবার রাগ, ঠিক রাগ নয়, পাগলের ওপর কি রাগ করা যায়? কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, তুমি এ কী করছ বলো তো? তোমাকে পাঁচিলে উঠতে কেউ দেখে ফেলতে পারে, তুমি আমায় ভালোবাসো, তবু তুমি আমার এই ক্ষতি করতে চাও? ছি ছি ছি! প্লিজ স্বপন, প্লিজ, এক্ষুনি চলে যাও। তা শুনে স্বপন আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরল। আগে কখনও আমাকে স্পর্শ করেনি। হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বলল, ভাবী, কালই আমাদের খুব বড় অ্যাকশনে যেতে হবে, খুব সম্ভবত বেঁচে ফিরব না, আপনার সাথে আর দেখা হবে না। মরে যাব, দেশের জন্য প্রাণ দিতেই তো এসেছি, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার এই একুশ বছর বয়েসে আমি কোনও মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারিনি, শরীরের কিছু... মনের কথাও জানি না। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, নারীশরীরের

BanglaBook.org

যে মাধুর্য তা কিছুই জানা হবে না? জানি, এরকমভাবে আসা খুবই অন্যায়... আমি আপনার দয়া চাইছি, দয়া চাইছি, একটি বার... ওর গলার ওই যে-ব্যাকুলতা, সেটা একেবারে ভেতর থেকে উঠে আসা! তাতে আমি যেন কেঁপে উঠলাম। আমি ওকে কী দিতে পারি? আমি বিবাহিত মহিলা, আমাদের একটা সংস্কার তো আছেই। ওর মৃত্যুচিন্তাটাও একেবারে অলীক নয়, এর মধ্যেই বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ফিরে আসেনি, আর এখন ঘোর যুদ্ধের সময়...। এরকমভাবে দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। হঠাৎ দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আমি ওকে একটা চুমু দিলাম। যাস্ট আ পেক যাকে বলে, ঠোঁটে নয়, গালে। ও শিশুর মতন বলল, আর একটা, আর একটা...। এবার আমি ওর ঠোঁটেই চুমু দিলাম, বেশ বোঝা গেল ও চুমু খেতে জানে না, আমার ঠোঁট কামড়ে দেয় আর কী, তারপর আমিও ওর গলা জড়িয়ে ধরে, ভালোভাবে, তারপর ও এমন করতে লাগল, আমাকে আর ছাড়েই না, ছাড়েই না, অসম্ভব গরম ওর শরীর, ওরকম শরীরের তাপ তো বিবাহিত জীবনে বেশি দিন পাওয়া যায় না, যেন ও গোটা এক জীবনের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে চায়, আমারও জড়তা কেটে গিয়ে...খানিক বাদে ঝোঁক সামলাতে না পেরে আমরা দু'জনেই পড়ে গেলাম মেঝেতে। হয়তো এর পরেও আরও কিছু হতে পারত, কেননা তখন আমিও অন্য সব কিছু ভুলে গেছি...। হঠাৎ কার যেন পায়ের আওয়াজ পেয়ে ও আমাকে ছেড়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে গেল। আমি কারুকে দেখতে পাইনি, ও সময় কে আর আসবে, হয়তো পায়ের আওয়াজ নয়, অন্য কোনও শব্দ, ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে...

BanglaBook.org

সেই স্বপন কি তার পরের দিনই যুদ্ধের অ্যাকশনে চলে গিয়েছিল?

না! আরও দু'দিন পর। কিন্তু ওরা তিন বন্ধু সবসময় একসঙ্গে থাকত, আলাদাভাবে ওর আসা আর সম্ভব হয়নি। তবে তিন বন্ধুই শেষ দিন সন্ধের পর এসেছিল আমার কাছে, কথায় কথায় যুদ্ধ শেষ হলে একদিন সাদা ভাত আর বেগুন দিয়ে চিংড়ি মাছের পাতলা ঝোল খেতে চেয়েছিল। ওখান থেকেই একটি ছেলে ওদের ডেকে নিয়ে যায়। ওরা তিন জনই আর ফেরেনি। যুদ্ধ থামার পরও ওদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনেকদিন পর জহিরের সঙ্গে আমার দেখা হল, এ বাড়িতেই সে এসেছিল। সেই কনফার্ম করল, তার অন্য দু'জন বন্ধু শহিদ হয়েছে, সে নিজেও খুব আহত হয়েছিল।

সেই স্বপনকে তোমার এখনও মনে পড়ে?

হ্যাঁ, মনে তো পড়েই মাঝে মাঝে। সে যখন বলছিল, আমি মরে যাব, কিন্তু নারীর কী মাধুর্য, তা একটুও জানা হবে না? তখন আমার একজনের কথা মনে পড়েছিল। একজন অন্ধ মানুষ, জন্মান্ধ, ওই গ্রামেরই মানুষ, তার নাম জটু, সে আমাকে বলেছিল, আর সব কাজই তো পারি, তবে দুঃখ কী জানেন, নিজের মায়ের মুখটাই সারা জীবনে দেখা হল না! দু'জনের কথার হয়তো ঠিক মিল নেই, তবু মনে পড়েছিল।

আচ্ছা মা, ও কি নারীর মাধুর্য শব্দটাই ব্যবহার করেছিল?

হ্যাঁ। ওর চিঠির ভাষাতেও এইরকম শব্দ থাকত। শেষ যেদিন ওরা তিনজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, ও তো শুধু আমার চোখে চোখ রাখছিল, একটা-দুটোর বেশি কথাই বলেনি। হঠাৎ ওদের ডাক এসে পড়ায়, তিনজনই আমার পায়ে

BanglaBook.org

হাত দিয়ে প্রণাম করতে এল, বারণ করতে গিয়ে আমি শুধু স্বপনের হাত চেপে ধরলাম। ওকে আমার সেই-ই শেষ স্পর্শ! জুলি, তুই বল তো, আমি যা করেছি, সেটা অন্যায় কিংবা পাপ?

মা, আমি তোমার ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করব?

ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গেলে, বাবা মা সম্পর্কে... হ্যাঁ, তাদের দোষ-ত্রুটির বিচার তো করতেই পারে!

আমি বললাম, মা, বাবার চেয়ারটার পাশের চেয়ারে একটা বই ওলটানো দেখছিলাম। তুমিই পড়ছিলে নিশ্চয়ই। অরহান পামুকের 'স্নো'। তুমি এখনও নিয়মিত বিদেশি বই পড়ো?

বাংলাও পড়ি, ইংরেজিও পড়ি। পাড়ার একটা লাইব্রেরি থেকে আনাই। বই নিয়েই তো ভালো সময় কেটে যায়।

তুমি বার্ট্রান্ড রাসেলের আত্মজীবনীটা পড়েছ?

না তো, সেটা পড়া হয়নি।

সকলের পড়ার মতন বই। আমি তোমাকে বইটা কিনে দিয়ে যাব। ওই বইতে একটা ঘটনা আছে, সেটা আমার খুব বলতে ইচ্ছে করছে। বলব?

বল না।

রাসেল যখন ছোট, ওর এক দাদা ছিল, তার ছিল এক প্রাইভেট টিউটর। তারও বয়েস বেশি না। ছোকরা মতন। সে খকর খকর করে কাশত। কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল, তার টিবি হয়েছে। ওরা বলত কনজাম্‌পশান। এ রোগের তখন কোনও চিকিৎসা ছিল না। মৃত্যু অবধারিত। ওর খুব অ্যাডভান্সড অবস্থা, বড়জোর এক বছর আয়ু। ওই মাস্টারটিকে নিয়ে রাসেলের মা-বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ওঁরা দু'জনেই

BanglaBook.org

আলোচনা করতে লাগলেন যে, ছেলেটি যদি এর মধ্যে বিয়ে করে, তা হলে সর্বনাশ হবে। ওর বউ আর ভবিষ্যৎ সন্তানদের মধ্যেও এই রোগ ছড়াবে। বিয়ে না করেও যদি বিভিন্ন বান্ধবীর সঙ্গে সহবাস করে, তা হলেও এই একই বিপদ। আবার, ওর যে ক'মাস আয়ু আছে, সেই সময়টায় কোনও মেয়ের সঙ্গ পাবে না? ওকে বারণ করলেই বা ও শুনবে কেন? সারা দেশে তখন এই রোগ নিয়ে আলোড়ন চলছে। একমাত্র উপায়, কোনও নারী যদি সব জেনেশুনে এই কয়েক মাস ওর শয্যাসঙ্গিনী হয়। কোন নারী? রাসেলের বাবা তাকালেন তাঁর স্ত্রী দিকে, তিনি বললেন, আমি রাজি। আমরা তো অনেকটাই জীবন ভোগ করেছি, এখন চলে গেলেও ক্ষতি নেই।

অ্যাঁ! কী বলছিস। ভদ্রমহিলা পারলেন?

হ্যাঁ পারলেন, স্বামীর সম্মতি নিয়ে সেই অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা ছেলেটির শয্যায় নিয়মিত সঙ্গ দিতেন। আর এই ঘটনার কথা লিখছেন কে? ওঁদের ছেলে। কতটা মানসিক উচ্চ স্তরে পৌঁছোতে পারলে সামাজিক ন্যায়-নীতি, পাপ-পুণ্য এইসব হাবিজাবি তুচ্ছ হয়ে যায়। এইসব মানুষই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ওঁরা যা করেছেন, তুমিও ঠিক তাই-ই করছ। না করলেই ছোট হয়ে যেতে।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, আমার ধারণা, বাবা যদি দিল্লির বদলে সেখানে উপস্থিত থাকতেন, বাবাকে জানালে তিনিও রাজি হতেন। অন্তত আমার বাবা রাজি হতেন, এই বিশ্বাসটা আমি রাখতে চাই।

হঠাৎ মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

আমার কেমন যেন ধাঁধার মতন লাগল। এ কান্নার মানে

BanglaBook.org

বোঝা তো দুষ্কর। এখন আমার কী করা উচিত। কেউ কাঁদতে চাইলে কাঁদতে দেওয়াটাই তো সংগত। কিন্তু এই কান্নার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে, আরে একী! আমারও চোখে জল এসে যাচ্ছে কেন? আমি কেন কাঁদতে যাব? এ বাংলার জল-বাতাসের দোষ।

কিছু না ভেবেই আমি উঠে গিয়ে মায়ের কাঁধে হাত রেখে শুধু বললাম, মা।

কতকাল পরে স্পর্শ করলাম মাকে।

মা অমনি আমার হাতটা তাঁর ঠোঁটের কাছে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলেন, জুলি, জুলি, জুলি!

আমি মায়ের সঙ্গে কাঁদছি। কিন্তু আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে, তা কিছুতেই বোঝানো যাবে না অন্য কারুকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org